সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

প্রগতি-২০১২

22nd Shraban, 1418 Rabindranath Thakur's Death Anniversary Celebration

Wins N.C.C. Trophy By N.C.C. Cadets.

N.S.S. Volunteers

Swamiji's 150th Birthday Celebration

Blood Donation by N.S.S. Volunteers

Blood Donation By N.S.S. Volunteers

Blood Donation By N.S.S. Volunteers

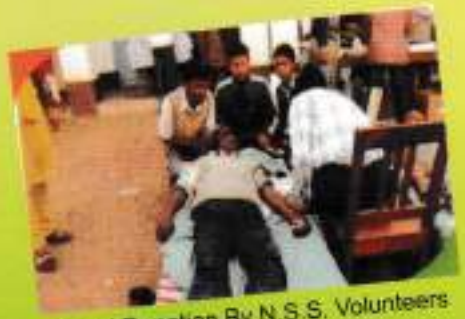

Blood Donation By N.S.S. Volunteers

সোনামুখী কলেজ বার্ষিক পত্রিকা

প্রগতি-২০১২

পরিচালনায় ঃ ছাত্র সংসদ

পত্রিকা যুগ্ম সম্পাদক - মঃ সেখ মইনুদ্দিন ও অনিরুদ্ধ নায়েক

পত্রিকা যুগ্ম সহঃ সম্পাদক- বিল্টু ঘোষ ও পবিত্র নন্দী

প্রগতি-২০১২

প্রকাশক	ঃ	ডঃ বিজয়কৃষ্ণ ভাণ্ডারী অধ্যক্ষ, সোনামুখী মহাবিদ্যালয় সোনামুখী, বাঁকুড়া, পিন-৭২২৭০৭
প্রকাশকাল	ঃ	ডিসেম্বর, ২০১২
পত্রিকা কমিটি	ঃ	অধ্যাপক ইন্দ্রজিৎ দাস (তত্ত্বাবধায়ক) অধ্যাপক মইনুল হক অধ্যাপিকা আসরফি খাতুন মঃ সেখ মইনুদ্দিন ও অনিরুদ্ধ নায়েক (পত্রিকা সম্পাদক) বিল্টু ঘোষ ও পবিত্র নন্দী (পত্রিকা সহঃ সম্পাদক)
পত্রিকা সদস্য/সদস্যা	ঃ	বুদ্ধদেব গোলদার পিন্টু হালদার দেবাশীষ চক্রবর্ত্তী
পরিকল্পনা ও অলঙ্করণ	ঃ	কুনাল মুখার্জী, বুদ্ধদেব লাই, তন্ময় পালিত ও সুরজিৎ ঘোষ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	ঃ	অধ্যাপক সুবীর চৌধুরী, ডঃ বাপ্পাদিত্য মণ্ডল, অধ্যাপক রাতুল সাহা।
পরিচালনা	ঃ	ছাত্র সংসদ
প্রচ্ছদ অলঙ্করণ	ঃ	ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
অক্ষর বিন্যাস ও মুদ্রণ	ঃ	শ্রীমা প্রিন্টার্স, সোনামুখী, বাঁকুড়া। মোঃ-৯৮৫১৪৪০১২৫

SONAMUKHI COLLEGE

P.O.-Sonamukhi, Dist.-Bankura, PIN-722 207 (W.B.)

From :

DR. BIJAY KRISHNA BHANDARI

Principal

FROM PRINCIPAL'S DESK

PRAGATI-2012, the Annual Patrika of Sonamukhi College, is the fruition of literary endeavour of the students and of my colleagues, teaching and non-teaching. It has intrinsic wealth. It is enriched with reflection on fast moving and shifting environments of society; it reflects the growing minds of students and maturity of my colleagues. **PRAGATI-2012** is the culmination of combined efforts of teachers, staff and students in augmenting and achieving administrative, infrastructural and educational improvement of this College. Undiminished but good criticism and constant source of encouragement is what society needs to srtide ahead.

Constructon not destruction is what mankind needs, stagnancy is what mankind has to shake off, we need changes- change for the better. Our **PRAGATI-2012** is sure to usher in new hope and is to be crowned with success.

(B.K. Bhandari)
PRINCIPAL
Sonamukhi College

সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদন

বহু প্রতীক্ষার পর প্রকাশিত হল আমাদের সকলের প্রিয় পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১২। প্রগতি মানে এগিয়ে চলা, প্রগতি মানে উন্নতি, প্রগতি মানে উন্নয়নের ফুটন্ত নতুন সকাল, প্রগতি মানে জমকালো অন্ধকারকে ঘুচিয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র।

কিন্তু বর্তমান সময়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের অর্থনৈতিক দুর্বলতা, দারিদ্রতা, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ, দেশের রাজনৈতিক হানাহানি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প সব দিক থেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে গোটা দেশ।

তাই আজ যারা উন্নয়নকে একটা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রেখে লুটেপুটে খেতে চাইছে -- সেই ধান্দাবাজী, পুঁজিপতিদের উন্নয়ন স্তব্ধকারীদের কালো হাত ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে চাই -- আর এই অন্ধকারের বৃন্ত থেকে আলোর ফুটন্ত সকালকে ছিঁড়ে আনার শপথ নিতে হবে ছাত্রসমাজকে।

ছাত্র সমাজ চাই উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প সবদিকে দিয়েই। স্কুল থেকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় -- সব ক্ষেত্রে শিক্ষাকে আরো গুণগতভাবে মান বাড়াতে ও প্রসার বাড়াতে। সঠিকভাবে পরিচালনা, জ্ঞান অর্জন এবং শিক্ষার আলোকে প্রসারিত করা।

আমরা চাই ছোটো ছোটো শিশু পাঠশালা থেকে ইংরাজী শিক্ষা অর্জন করুক। আর এই ইংরাজী শিক্ষাকে যারা পূর্বে বন্ধ করে রেখেছিলেন, পাঠশালাতে- ছাত্রসমাজ তাদের ক্ষমা করবে না।

আগামী দিনে আমাদের কলেজও বিশ্ববিদ্যালয়, জেলা, রাজ্য গোটা দেশে আমাদের এগিয়ে থাক উন্নতীর শিক্ষায়--এই প্রত্যাশা রাখছি আমাদের প্রগতি পত্রিকায়। কলেজ ছাত্র সংসদের বাৎসরিক পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে আমরা যেমন গর্বিত তেমনই কলেজের পঠন পাঠনের দাবী আদায়ের ক্ষেত্রেও।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

বলরাম লাহা

সাধারণ সম্পাদক

ক্রীড়া সম্পাদকের প্রতিবেদন

কিছুদিন আগে পেরিয়ে যাওয়া শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধুর স্মৃতি এখনও আমাদের মনে। অবশেষে প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও প্রকাশিত হল আমাদের কলেজের সকলের প্রিয় বাৎসরিক পত্রিকা 'প্রগতি' - ২০১২। শারদোৎসব ও দীপাবলীর মধ্যবর্তীকালে কাশ, শিউলি পথের শুভ্র আঁচল বিছিয়ে লক্ষ্মীদেবীকে বরণ করে নিয়েছি, ঠিক সেই রকম আমাদের প্রিয় পত্রিকা 'প্রগতি' কলেজের সকলের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত।

পশ্চিমবাংলার জনগণ এক সুন্দর, সাধারণের মা, মাটি মানুষের সরকারকে এনে দিয়েছে। সে সরকার মাত্র কয়েক মাসেই শিক্ষা, খেলাধূলা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবার লক্ষে। যা বিশ্ববাসীর কাছে দেশের সম্মান বাড়িয়েছে।

যদিও বর্তমান শতাব্দীতে খেলাধূলা পেশাদারিত্বের কবলে পড়ে কিছুটা পিছিয়ে তবুও আমাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে খেলাধূলার মানকে উন্নয়নমুখী করা।

প্রত্যেক বছরের মতো এ বছরেও আমরা ছাত্র সংসদ কলেজের খেলাধূলার মান উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টান্ত রেখেছি। বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও সাথে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসাহের সাথে পরিচালিত হয়েছিল। কলেজের ছাত্রছাত্রী অত্যন্ত উৎসাহের সাথে প্রতিযোগিতাগুলিতে অংশগ্রহণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মীবৃন্দের সহযোগিতায় সর্বাঙ্গক সফল ও সার্থকভাবে সম্পন্ন হয়। ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছিল প্রচুর ইভেন্ট সাথে সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জন্য ছিল বেশ কিছু আকর্ষণীয় ইভেন্ট। এ বছরও আমাদের কলেজ নিষ্ঠার সঙ্গে কলেজ ফুটবল টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণ করে। সেখানে শেষমেশ পরাজিত হলেও তারা খুব ভালো খেলেছিল। এছাড়া এ বৎসর অন্তঃবিভাগের ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় ছিল ছাত্রছাত্রী উভয়ের ক্যারম প্রতিযোগিতা। যা সত্যই ছিল আকর্ষণীয়।

বর্তমানে খেলাধূলার মান উন্নয়ন করতে হলে আমাদের সকল স্তরের মানুষকে খেলাধূলার প্রতি আগ্রহী হতে হবে। খেলাধূলার পাশাপাশি দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের মান উন্নয়ন করতে সকলকে প্রয়াসী হতে হবে। যাই হোক, এখানে আমার কলম সমাপ্ত করলাম। জয় হিন্দ। বন্দে মাতরম্।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

যুগ্ম সম্পাদক - **প্রদীপ কুমার মান ও চন্দন মিশ্র**

যুগ্ম সহ সম্পাদক - **বীজয় বীট ও প্রদীপ কুমার বারুই**

ছাত্র-ছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি সম্পাদকের প্রতিবেদন

প্রত্যেক বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও অবশেষে প্রকাশিত হল আমাদের প্রত্যেকেরই বহু আশাদীপ্ত কলেজ পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১২। সেবা-ই হল পরম ধর্ম। শিব জ্ঞানে জীব সেবা-ই পরম তৃপ্তি। বিগত বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আমরা ছাত্র সংসদের তহবিল থেকে ছাত্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করেছি। আমাদের কলেজে পড়তে আসা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী কৃষিজীবী খেতমজুর গরীব পরিবারের। সেইসব ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের যথেষ্ট পরিমাণ টাকা থাকে না। গত বৎসরের মতো এবৎসরও আমরা ভর্তি ও ফর্ম ফিলাপের সময় ৫৮,৯০০ টাকা ছাত্র-ছাত্রীদের AID FUND দিয়ে সাহায্য করেছি।

দিবা বিভাগ--	৩১,৬০০-০০ টাকা
প্রাতঃ বিভাগ -	২৭,৩০০-০০ টাকা
মোট-	৫৮,৯০০-০০ টাকা

এছাড়া গত বৎসরের মতো এবারেও দিবা বিভাগে ৩৯৭ জন ও প্রাতঃ বিভাগে ৩০০ জনকে কলেজে অর্ধ বেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছি। উল্লেখ্য এই বৎসর সর্বপ্রথম কলেজে গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদেরকে ৫০০ টাকা করে স্কলারশিপের ব্যবস্থা করতে পেরে আমরা খুবই আনন্দিত। ভবিষ্যতে একই রকমভাবে ও আরো ভালোভাবে ছাত্রছাত্রীদের পাশে ও সাথে থাকতে পারি এবং তাদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে পারি এবং সোনামুখী কলেজের শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরো সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি সেই জন্য গরীব ছাত্রছাত্রীদের একনিষ্ঠ সমর্থন আমাদের পরিচালিত ছাত্র সংসদের উপর থাকবে এই আশা রাখি।

পরিশেষে পত্রিকার মাধ্যমে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল ছাত্রছাত্রীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনার সাথে সাথে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

'জগতে সর্বদা দাতার আসন গ্রহণ করো,
সর্বস্ব দিয়ে যাও আর ফিরে কিছু চেয়ো না।'

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ--

দিবাবিভাগ

যুগ্ম সম্পাদক-**অতনু গরাই ও সেখ সাদ্দাম**
যুগ্ম সহ সম্পাদক -**অভিষেক ঘোষ ও বিশ্বজিৎ মাজি**
সদস্য/সদস্যা -**চন্দন সূত্রধর, অরূপ বৈদ্য, অভিষেক সাহা**

প্রাতঃবিভাগ

যুগ্ম সম্পাদক-**সুদন রজক ও বুদ্ধদেব লাই**
যুগ্ম সহ সম্পাদক -**কাশীনাথ পাঁজা ও সঞ্জয় পাল**
সদস্য/সদস্যা -**সিদ্ধেশ্বর চেল, পার্থ নায়ক, মিলন ঘোষ**

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের প্রতিবেদন

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন লেখার শুরুতেই প্রথমেই জানাই আমার শ্রদ্ধা, ভালোবাসা সকলকে, আমরা খুশি প্রগতি পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পেরে।

"সাংস্কৃতিক" বিষয়টি খুবই কঠোর। সংস্কৃতি অর্থাৎ Culture সংগীত হতে পারে, নৃত্য হতে পারে, কলাকৌশল বা মেধা হতে পারে। তাই বিষয়টি আমাদের কাছে যথেষ্ট যত্নের ও সম্মানের।

আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকি। কিন্তু আরও দুটি শ্রদ্ধানুষ্ঠান আমাদের মানবহৃদয়কে গভীরভাবে জাগ্রত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিবেকানন্দের সার্ধশতবর্ষ পালন জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে সম্মান জানিয়েছে এবং এর জন্য আমরা গর্বিত।

এছাড়া কলেজে আমরা সরস্বতী পুজো, ১৫ই আগস্ট, ২৩শে জানুয়ারী, ২৬শে জানুয়ারী, ৫ই সেপ্টেম্বর গভীর শ্রদ্ধার সাথে পালন করি। সকল ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত থেকে আমাদের সহযোগিতা করে।

প্রত্যেকবার আমরা নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের বরণ করে নেওয়ার জন্য নবীন-প্রবীন মিলন উৎসব পালন করি। যা কলেজের মানকে অনেকখানি বৃদ্ধি করে। প্রবীন থেকে নবীন, গ্রাম থেকে শহর সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠান মাতিয়ে দেয়।

প্রত্যেক বছর স্পোর্টস এবং গেমস্-এ কলেজ পার্শ্ববর্তী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় যা খুবই চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। এবং পরিশেষে আমরা একটি বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকি। তাতে বিভিন্ন চলচ্চিত্র খ্যাতনামা শিল্পীরা অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। ২০১২-র এই বৎসরও বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন চলচ্চিত্রের হাস্যকৌতুক বিখ্যাত অভিনেতা 'খরাজ মুখার্জী'।

পরিশেষে বলি সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।

সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, সংস্কৃতি আমাদের অহংকার, আমাদের গৌরব সুতরাং কৃষ্টি; সংস্কৃতির হাত ধরে পশ্চিমবাংলার উন্নয়ন হবেই হবে -- এই আশা রাখে ছাত্র সমাজ।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ-

যুগ্ম সম্পাদক - **দেবনাথ রক্ষিত ও প্রশান্ত নন্দী।**

যুগ্ম সহ সম্পাদক - **বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও প্রদ্যুৎ ডাঙর**

পত্রিকা সম্পাদকের প্রতিবেদন

সুধী,

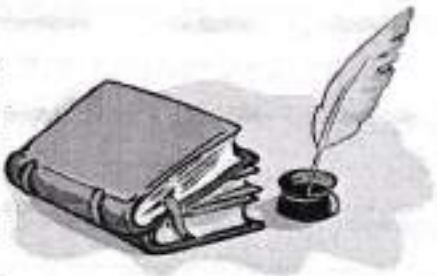

পত্রিকা সম্পাদকীয় কলমে লিখতে গিয়ে বারবার তাদের ছবি ভেসে ওঠে যারা আজ আমাদের মধ্যে নেই। প্রিয়জনদের হারানো অব্যক্ত কোনো ব্যথার চেয়েও ব্যথাতুর ও হৃদয়বিদারী। পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ সন্ত্রাসের ত্রাসে চলে গিয়েছে। তাপসী মালিক, সুজাতা দাস, দেবযানীর রক্ত যেন আজও তাজা। নন্দীগ্রামের গণহত্যার কর্ণবিদারী চিৎকার আজও বাংলার সমস্ত আকাশে বাতাসে। তাদের বিচারের বাণী আজও নীরবে কাঁদে। যারা চলেগেছে মৃত্যুর কোলে, যাদের আর ফিরে পাব না তাদের অমর আত্মার প্রতি জানাই শুভেচ্ছা ও তাদের পরমাত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

এরপর সোনামুখী কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ভাইবোন, দাদা-দিদি, সহপাঠী ও প্রতিটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে জানাই শুভেচ্ছা ও জাতীয়তাবাদী গৌরিক অভিনন্দন। বিগত বৎসরের মতো এ বৎসরও আমাদের কলেজের বহু আকাঙ্খিত বার্ষিক পত্রিকা 'প্রগতি' ২০১২ নিয়ে সকল সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের মনে জায়গা করে নিয়ে এই মহান কাজে ব্রতী হয়েছি। অতীতে সকলের সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে পথের দাবী করে সাফল্য লাভ করেছি, এবারও তার পূর্ণ মর্যাদা দিতে আমরা চেষ্টাবান। কলেজ পত্রিকা শিক্ষার এক অন্যতম কাজ হিসাবে বিবেচিত হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বহু সুপ্ত প্রতিভার প্রকাশ ঘটে কলেজে এই পত্রিকার মাধ্যমে। ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ ভাবনা লেখনীর মাধ্যমে এই পত্রিকায় প্রকাশ পায়। যাতে তাদের ভবিষ্যতের কবি, সাহিত্যিক ও উজ্জ্বল প্রতিভার পূর্বাভাষের বার্তার বাহক হয়ে ওঠে। যাদের সুন্দর লেখা কলেজের এই পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করেছে তাদেরকে অকপটে লেখকের আসনে স্বীকার করা শ্রেয়। কবিতার সাথে সাথে প্রবন্ধ, গল্প ইত্যাদি সাহিত্যের নানা সম্ভারের মহামিলন ক্ষেত্র হল এই কলেজ পত্রিকা। এই কলেজের পত্রিকা আমাদের কাছে সত্যই গুরুত্বপূর্ণ। তাই তার মানোন্নয়নে যথেষ্ট সংযত হয়েছে শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। তাই অনেক লেখাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষকগণদের বাতিলের খাতায় ফেলতে হয়েছে। যার জন্য আমরা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থী।

কলেজের শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রতিযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয়ের তথ্যসূত্র হল এই বার্ষিক পত্রিকা। ছাত্রছাত্রীদের বহু আকাঙ্খা থাকে এই পত্রিকার উপর। যার মাধ্যমে তারা বৎসরান্তে

সংসদের নেতৃত্বে কলেজের উন্নয়নমূলক সুসংবাদ জানাতে পারে। এই পত্রিকা থেকেই বোঝা যাবে যে কলেজ কোন সত্য সুন্দরের চর্চা করছে; আলোকের কোন দিশায় সঠিক পথে পরিণতির লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। যা কলেজের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে উল্লেখ্য ভূমিকা বহন করবে। কিছু ব্যক্তির ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, তারা মনে করেন যে দল ছাত্র সংসদের ভূমিকায় থাকে তাদের প্রচার ভূমিকা হল এই পত্রিকা, কিন্তু এ ধারণা নিতান্তই ভুল। আমাদের এই পত্রিকাতে দলাদলির কোন ভূমিকা নেই। কলেজের প্রতিটি সদস্যের এই পত্রিকায় অবাধ স্বাধীনতা, দায়িত্ব ও সম্মান একাকার। যা আমরা সানন্দে নিয়েছি যা ধ্রুব সত্য। আপনারা পত্রিকা প্রকাশের যে গুরুদায়িত্ব আমাদের দিয়েছিলেন তা কতটা পালন করতে পেরেছি তার বিচার করার দায়িত্ব আপনাদের হাতেই দিলাম। পত্রিকায় যদি কোন ত্রুটি থাকে তার জন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

পরিশেষে কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মীবৃন্দদের জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ছাত্রছাত্রীদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ--

যুগ্ম সম্পাদক - **মঃ সেখ মইনুদ্দিন ও অনিরুদ্ধ নায়েক**

যুগ্ম সহ সম্পাদক- **বিল্টু ঘোষ ও পবিত্র নন্দী**

"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনামুখী কলেজ পরিচালন সমিতি

১। মাননীয় শ্রী অদীপ কুমার রায় *(মহকুমা শাসক, বিষ্ণুপুর)*	সভাপতি
২। মাননীয় ডঃ বিজয়কৃষ্ণ ভাণ্ডারী *(অধ্যক্ষ)*	সম্পাদক
৩। মাননীয় তপন দত্ত	সদস্য
৪। মাননীয় অতনু ব্যানার্জী	সদস্য
৫। মাননীয়া কল্পনা গুপ্ত	সদস্যা
৬। মাননীয় মিহির মুখোপাধ্যায়	সদস্য
৭। মাননীয় বিপুল দে	সদস্য
৮। মাননীয় দীপক নিয়োগী	সদস্য
৯। মাননীয় বাপ্পাদিত্য মণ্ডল	সদস্য
১০। মাননীয় রবিশংকর সিদ্ধান্ত	সদস্য
১১। মাননীয় নেপাল চন্দ্র দত্ত	সদস্য
১২। মাননীয় শক্তিপদ দে	সদস্য
১৩। মাননীয় বলরাম লাহা	সদস্য

Iron nerves with a well intelligent brain, and the whole world is at your feet.

–Vivekannanda

LIST OF THE COLLEGE STAFF

➢ **Principal :**

Dr. Bijay Krishna Bhandari M.Sc., B.Ed. (Sc), Ph.D.

TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

➢ **Dept. of Bengali :**

1. Dr. Asrafi Khatun	M.A., B.Ed.,Ph.D.	Asstt. Professor
2. Sk. Moinul Haque	M.A.	Asstt. Professor
3. Smt. Sumana Sanyal	M.A.	Asstt. Professor
4. Sri Amar Patra	M.A.	Asstt. Professor

➢ **Dept. of English :**

1. Dr. Dharmadas Banerjee	M.A.,Ph.D.	Associate Professor
2. Sri Indranath Mukherjee	M.A.	Part-time Teacher
3. Sri Salil Bhuin	M.A.	Part-time Teacher

➢ **Dept. of Sanskrit :**

1. Sri Kajal Pal	M.A.	Part-time Teacher
2. Smt. Purnima Shit	M.A.	Part-time Teacher
3. Sri Achintya Adhikari	M.A.	Part-time Teacher

➢ **Dept. of Political Science :**

1. Sri Indrajit Das	M.A.	Associate Professor
2. Sri Dipak Kumar Neogi	M.A.	Associate Professor
3. Smt. Swagata Chakraborty	M.A.	Part-time Teacher

➢ **Dept. of Philosophy :**

1. Smt. Sudhamoyee Kumar	M.A.,M.Phil.,B.Lib.Sc.	Associate Prefessor
2. Smt. Jayeeta Kundu	M.A., B.Ed.	Part-time Teacher
3. Sri Ashok Dhani	M.A., B.Ed.	Part-time Teacher

➢ **Dept. of History :**

1. Md. Sahjamal	M.A.	Associate Professor
2. Sri Asim Konar	M.A.,B.Ed.	Part-time Teacher
3. Sri Ashoke Ghosh	M.A.,B.Ed.,M.Ed.	Part-time Teacher
4. Smt. Sreema Pal	M.A.,B.Ed.	Contractual Teacher

➢ **Dept. of Economics :**

1. Dr. Bipul De — M.Sc.,M.Phil.,Ph.D.,P.G.D.H.E. Assistant Professor
2. Sri Ratul Saha — M.A.,B.Ed. Assistant Professor

➢ **Dept. of Commerce :**

1. Dr. Swapan Kumar Samanta — M.Com.,B.Lib. Sc.,Ph.D. Associate Professor
2. Sri Subir Kumar Chowdhury — M.Com. Assistant Professor
3. Dr. Arun Kumar Roy — M.Com, M.Phil., Ph.D.Associate Professor
4. Dr. Chhotelal Chouhan — M.Com., M.Phil.,B.Ed.,Ph.D. Assistant Professor

➢ **Dept. of Physics :**

1. Dr. Bappaditya Mandal — M.Sc., Ph.D. Assistant Professor

➢ **Dept. of Chemistry :**

Guest Faculty Members.

➢ **Dept. of Botany :**

1. Dr. Parthasarathi De — M.Sc.,Ph.D.Associate Professor
2. Dr. Dipak Kr. Hens — M.Sc., Ph.D. Assistant Professor
3. Dr. Sunita Mukhopadhyay — M.Sc.,M.Tech., Ph.D. Assistant Professor

➢ **Dept. of Zoology :**

1. Dr. Subhrakanti Sinha — M.Sc., Ph.D.Associate Professor
2. Sri Biplab Banerjee — M.Sc. — G.L.I.
3. Smt. Sumana Kaviraj — M.Sc., B.Ed. — Part-time Teacher

➢ **Dept. of Mathematics :**

1. Sri Joydeb Mondal — M.Sc.Associate Professor

➢ **Dept. of Geography :**

1. Sri Susanta Chand — M.A. — Part-time Teacher

NON - TEACHING STAFF (DAY SHIFT)

Class-III Staff

1. Sri Debabrata Chatterjee -- Head Clerk
2. Sri Partha Sarathi Roy -- Accountant
3. Sri Rabisankar Siddhanta -- Cashier
4. Sri Haradhan Dey -- Lab. Inst. (Non-grad.)
5. Sri Nikhil De -- Clerk

6. Smt. Shelly Banerjee	--	Clerk
7. Sri Anisur Rahaman Mondal	--	Clerk
8. Sri Santimoy Laha	--	Clerk

Class-IV Staff

1. Sri Bamacharan Ankure	--	Bearer
2. Sri Mrityunjoy Mukherjee	--	
3. Sri Debasis Biswas	--	
4. Sri Pronay Sarkar	--	Lib. Peon
5. Sri Bhairab Banerjee	--	Farash
6. Sri Subhas Lohar	--	Sweeper
7. Sri Nepal Dutta	--	Lab. Attendent
8. Sri Sukumar Ghosh	--	Lab. Attendent
9. Sri Ashok Mukherjee	--	Lab. Attendent
10. Smt. Kunti Dom	--	Sweeper
11. Smt. Lilabati Bhattacharya	--	Lab. Attendent
12. Sri Pradip Nag	--	Guard
13. Sri Lakshmi Kanta Mandi	--	Lab. Attendent

TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1. Sri Baplab Banerjee	M.Sc.	In-charge (Morning Shift)
2. Smt. Suchandra Chetterjee	M.A.	Contractual Teacher (Philosophy)
3. Sri Madhab Kundu	M.A.	Contractual Teacher (History)
4. Sk. Mokbul Hoque	M.A.	Contractual Teacher (Bengali)
5. Smt. Tanima Mohanta	M.A.	Contractual Teacher (Bengali)
6. Sri Manojit Ghosh	M.A.	Contractual Teacher (History)
7. Dr. Radhamadhab Goswami	M.A., Ph.D.	Contractual Teacher (Sanskrit)

NON TEACHING STAFF (MORNING SHIFT)

1. Sri Mohan Chandra Dutta	-	Typist
2. Sri Ananda Das	-	Lib. Clerk
3. Smt. Bony Roy	-	Lib. Peon
4. Sri Madan Ram Jadav	-	Peon
5. Sri Swapan Ankure	-	Peon

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
কবিতা ঃ-		
ডঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন	সুরজিৎ পাল	১
তুমি কে?	শুভ্রা কর্মকার	১
জীবন কাহিনী	পূজা মিত্র	২
শরৎ কাল	তরুণ ঘোষ	২
তোমার করে নাও	সৌমাভ কারক	২
নীরব প্রেম	আসমাউল মিদ্যা (মিলন)	৩
কবর দেশে মা	আবদুল্লা হক মিদ্যা (বাবু)	৩
তুমি আসাতে	মহম্মদ সাফীউল্লা হক মল্লিক (তুফান)	৪
বিড়ি	অরূপ বৈদ্য	৪
শরৎ দিনের গান	তিলক সূত্রধর	৪
আমরা ৬ জন	টুয়া দে (রেশমা)	৫
তবুও কবি	সুমন দে	৫
সরি	শানে আজমত মোল্লা	৬
হারিয়ে যাব যেদিন আমি	নার্গিস সুলতানা	৭
অপেক্ষা	সিরাজুল মল্লিক	৭
চৈতন্য বাণী	রুদ্রনীল মুখার্জী	৮
দুর্ভিক্ষের কথা	আল্পনা সু	৮
তুমি নেই	বাপ্পা মাজি	৯
ভাঙা ঘরে আমি একা	টুয়া দে (রেশমা)	৯
কোথায় তুমি?	অভয়া দাশগুপ্তা	১০
দাঁতাল হাতি	রাজীব ঘোষ	১০
ক্রোধ	কাশীনাথ পাঁজা	১০
বিদায় বেলায়	বীরেন ধাড়া	১১
বৃষ্টির স্বপ্ন	জয় সাহা	১১
রূপান্তরিত স্বপ্নভয়	কাকলি রানা	১২
শহীদ স্মরণ	সেখ সাদ্দাম হোসেন	১২
নেশা	মিলন ঘোষ	১৩
ভেজাল	প্রশান্ত নন্দী	১৩

সোনামুখী মহাবিদ্যালয় বার্ষিক পত্রিকা ঃ প্রগতি-২০১২

বিষয়	লেখক/লেখিকার নাম	পৃষ্ঠা
বন্ধু	প্রদীপ বাড়ুই	১৪
কেন মোরে ডাক	শুভরাজ ব্যানার্জী	১৪
সিন্ধুর বিন্দু	গিয়াসুদ্দিন সেখ	১৫
আমার প্রিয় গান	আকাশ সাহা	১৬
ম্যাগাজিনের ডাকে	সুমিত কর্মকার	১৬
সুনামি	রিন্টু ঘোষ	১৬
বৃষ্টি	বলরাম ভট্টাচার্য্য	১৭
আমাদের কলেজ	কাঞ্চন দাস	১৭
নেতা	তন্ময় পালিত	১৮
পাখা ও আলো	আকাশ ধাড়া (বীরেন)	১৮
গভীরে	অতনু গরাই	১৯
পার্থেনিয়ামের খোঁজে এক আত্মগবেষক নেতাজী নগরে	শচীন্দ্রনাথ কুমার	২০
মৃত্যু	মধুমিতা ঘোষ	২১
বিবর্ণ স্বাধীনতা দিবস	আবদুল্লা হক মিদ্যা (বাবু)	২২
গল্প / প্রবন্ধ ঃ-		
স্মৃতি ঘেরা জীবন	সঞ্চিতা দাস	২৩
দুই বন্ধুর কথা	মৌমিতা ব্যানার্জ্জী	২৫
রুকমনি	মন্দিরা দেলাই	২৭
শিক্ষা আগে না অর্থ আগে?	বিশ্বনাথ চন্দ্র	২৯
একরাশি বেদনার স্মৃতি	কাকলী মিশ্র	৩১
এক টুকরো ভুল	রিমা দেয়াসী	৩৩
নস্যির নেশায়	আবদুল্লা হক মিদ্যা (বাবু)	৩৫
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে	অনিরুদ্ধ নায়ক	৩৮
পরিবেশ প্রসঙ্গে একটি লেখা	ডঃ শুভ্রকান্তি সিন্‌হা	৪০
পশ্চিমবাংলার সম্পদ পাহাড় ও জঙ্গলমহল	কাশীনাথ পাঁজা	৪২
শিশু-কিশোর মাণিক	ডঃ আসরফী খাতুন	৪৩
তুমিই সুন্দরী	বিশ্বজিৎ বিশ্বাস	৫০
বিক্রিয়ার ভূত	সন্তু কোনার	৫২
সোনার বাংলা	অনিমেষ কোলে	৫৪
বিষ বৃক্ষ	সৌমি সিংহ হাজরা	৫৫
JOKES	আসমাউল মিদ্যা	৫৬
এন.সি.সি. ও চাকরিতে অগ্রাধিকার		৫৭

ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন

— সুরজিৎ পাল
(বি.এ. ভূগোল সাম্মানিক, ১ম বর্ষ)

হে মহান শিক্ষক তুমি
সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন,
তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হোক
দেশের ছাত্রগণ।
জন্ম তোমার হয়েছিল
৫ই সেপ্টেম্বরে,
কৃতিত্ব তুমি দেখিয়েছিলে
জন্মের কিছু পরে।
করেছ তুমি দেশবাসীকে
শিক্ষামন্ত্রে ব্রতী,
তাইতো এসেছে শিক্ষায়
দুর্বার এই গতি।
পরাধীনতার গ্লানি মুছে
শিক্ষাকে করেছ চালিত,
তাইতো তোমার জন্মদিন
শিক্ষকদিবস রূপে হয় পালিত।
শিক্ষাই জাতির প্রাণ
করেছ তুমি প্রমাণ,
শিক্ষাতে সবার সমান অধিকার
সবাই হবে সমান।
তুমিই জাতির মহান শিক্ষক
তুমিই জাতির মেরুদণ্ড,
তোমায় ছাড়া মোদের হৃদয়
হয়েছে শত খণ্ড।

তুমি কে?

— শুভ্রা কর্মকার
(বি.এ. দর্শন সাম্মানিক, ৩য় বর্ষ)

আমিএকদিন বেড়াতে গিয়ে
এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দৌড়াতে দৌড়াতে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম।
তোমার রূপের ঝলকানিতে
আমার অন্তরের গ্লানি মূর্ছিত করে
তোমাকে দুচোখ ভরে দেখলাম।।
তুমি এত রূপ, এত সৌন্দর্য নিয়ে
নিজেকে লুকিয়ে রেখেছো
অনন্ত আকাশের মধ্যে।
আজ আমি তোমার মধ্যে
সেই রূপ দেখতে পেয়ে
নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি নিজের মধ্যে।।
তুমি হঠাৎ লুকিয়ে গেলে
আমি পাগলের মতো
তোমায় খুঁজে বেড়ালাম।
কিন্তু দিনের শেষে ক্লান্তির পর
নীল আকাশের মধ্যে
তোমার মতই একজনকে দেখতে পেলাম।।
মনে ভাবলাম, তুমি কি বহুরূপী?
তুমি অনেক বেশ ধরো
তোমার রূপের মায়াবী আলোয়
নিজের মধ্যে অপরকে জড়াতে পারো।।
আমি এক অভাগিনী
যে তোমাকে জানার জন্য
নিজের সময়কে বলিদান দিয়েছে।
যে তোমার রূপের ভাগিদার হতে
তোমাকে পাবার আশায়
অনন্ত আকাশে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।।
তোমার অপেক্ষায় বছরের পর বছর
মাসের পর মাস কেটে গেছে
কিন্তু এখনো আমি বুঝতে পারিনি
তুমি কে?

জীবন কাহিনী

— পূজা মিত্র
(বি.এ. ১ম বর্ষ)

জীবনের চলার পথে একা
হঠাৎ কাউকে ভালো লাগলে তাকে
যদি না বলি 'I Love You'
তাহলে 'Paran jai jaliyare'
যদি তাকে কিছু সময় না দেখো
তাহলে কী মন মানে?
না তখন 'Mon mane na'
বুঝতে হবে শুরু হয়েছে 'Premer kahani'
এই পথে বাধা তো আসবেই
তাই নিতে হবে 'Challenge'
করতে হবে 'Agni Sapath'
তাহলে পাবো 'Jack pot'
শেষে 'Dujane' খুশি হয়ে বলবে
'Chiradiner tumi je amar'
তারপর হবে 'Sat pake bandha'
শুরু হলো 'Le chhakka'

শরৎ কাল

— তরুণ ঘোষ
(বি.এ. ১ম বর্ষ, প্রাতঃ বিভাগ)

ঢ্যাং কুড়া কুড় বাজনা বাজে
এল শরৎ কাল,
শিউলি ফুলের সুগন্ধে আজ
সবাই বেসামাল,
মাতল আজি পুজোর গন্ধে
আগমনির সুরে
সব ক্লান্তি, অবসরকে
যেন রেখে দূরে।
ঐ সুদূরে মাঠের পরে
সবুজ ঘেরা ঘাস,
শেষ হয়েছে ঘরে ঘরে
চাষীদের ওই চাষ।

তোমার করে নাও

— সৌমাভ কারক
(বি.এ. বাংলা বিভাগ ২য় বর্ষ)

যখন প্রথম প্রেমালাপ হয় তখন
আমি ছিলাম তোমার কাছে
সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের মত।

আর আজ যখন পুরানো হয়ে গেলাম
তখন আমায় তুলে রাখলে ডায়রীর মাঝে
ঝরে যাওয়া শুকনো গোলাপ পাপড়ির মতো।

যখন প্রথম প্রথম ফোনে কথা বলতাম
তখন সর্বদা তুমি কাছে আসতে চাইতে
যেমন ভ্রমর সদ্য ফোটা গোলাপের পাশে
আসতে চায়।

মধু যেই শেষ হয়ে গেল
অমনি তুমি ভুলে গেলে, কিন্তু
আমি যে এখনো তোমাকে চাই --

আবার তুমি ফিরে এসো,
আবার ভালোবাসো আমায়।
বার করো আমায় ডায়রীর মাঝ থেকে --
জোড়া লাগাও ওই ঝরা পাপড়িগুলো,
আবার তুমি আমাকে তোমার করে নাও.....।

নীরব প্রেম

—আসমাউল মিদ্যা (মিলন)
(বি.এ. সংস্কৃত সাম্মানিক)

তোমার কাছে চাইনি কিছু,
জানাইনি মোর নাম,
তুমি যখন বিদায় নিলে
নীরব রহিলাম।
একলা ছিলাম কুয়োর ধারে
নিমের ছায়ার চলে,
ধৈর্য্য ছেড়ে সবাই তখন
পাড়ায় গেছে চলে।
আমায় তারা ডেকে গেল
'আয় রে, বেলা বয়ে যায়'।
কোন আলসে ছিলাম বসে
কিসের ভাবনায়।
পদধ্বনি শুনি নাইকো
কখন তুমি এলে।
কইলে কথা নরম ঠোঁটে
করুণ চক্ষু মেলে।
বললে যখন ভালোবাসো আমায়
তুমি --
কেবল খেলারই ছলে?
জলের ধারা দিলেম ঢেলে
তোমারই চরণতলে
যা হয়েছে ভুলে যাও --
তোমায় না আমি দোষ দেব,
সুখে থেকো ভালো থেকো
শুধু দূর থেকেই চাইবো।

কবর দেশে মা

—আবদুল্লা হক মিদ্যা (বাবু)
(বাংলা সাম্মানিক, ৩য় বর্ষ)

বড় কষ্ট করে মা'গো, তোমায় শুইয়ে দিয়ে এসেছি
শীতল নরম মাটির নীচে,
মা'গো নিথর নিদ্রায় ছিলে তুমি তখন ....
শরতের আভায় বিছানো কাফন-ঢাকা শরীরে
তোমায় শেষপথ ভ্রমণ করেছিলাম তখন .....

মা'গো, তোমার মমতাময়ী উন্মোচিত মুখ যখন
স্পর্শ করেছিলাম শেষবারের মতন।
বজ্রের আওয়াজ সম, ভঙ্গুর বালিয়াড়ির মতো
হৃদয় মম ডুকরে কেঁদেছিল তখন।
জানি তোমার ওই ঘুম আর কোনদিন ভাঙবে না।
কোনদিন তুমি আমায় আর আদর করে কোলে নেবে না।

প্রত্যেক নিভৃতক্ষণে তোমার স্মৃতি আমায় নাড়া দেয়,
তখন নিঃসঙ্গ দ্বি-প্রহরে আমার পাঁজর বোবা
আর্তনাদ করে তাই।
মা'গো তুমি ছাড়া আমি যেন ধূধূময় মরুভূমির
স্মৃতিময় বালিকণা .....
যতই তোমায় ভুলতে চাই, ততই আমি বুঝতে পারি
যে, তোমায় ভুলতে পারবো না।

জানি না মা'গো মাটি তোমার সঙ্গে কি
আচরণ করছে?
হয়তো মাটি আমার মতোই নিঃসঙ্গ, তাই তোমায়
আপন করেই রেখেছে।
জানি না মা'গো, কি দুর্বিসহ অবস্থা ওই অন্ধকারপুরিতে
হয়তো নূরের ছটায় তুমি আছো বহাল তবিয়তে।
আমি চাই মা'গো তুমি থাকো আল্লার খাস হেফাজতে।
তোমায় জান্নাতবাসী করাতে চাই, তাই অনর্গল
ফেলে অশ্রুজল আমার নামাজের মোনাজাত।

তুমি আসাতে

—মহম্মদ সাফিউল্লা হক মল্লিক (তুফান)

জীবনের আনন্দ যেখানে শেষ হয়ে হতাশার ক্লান্তিতে ভরে গেছে
নীল দিগন্তের সবুজ প্রান্তর; মৃত্যুর বারুদের ঘ্রাণ মিশেছে
রক্ত কণিকায়; গ্রীষ্মের দাবদাহে হৃদয় যখন অবসন্ন হয়
কর্কশ কাকের ডাক বিষ ঢালে সদা, বর্ষার মত আসে যত ভয়।
হঠাৎ এক টুকরো মেঘ ভেসে আসে কোন তেপান্তরের কূল
হতে রজনীগন্ধার শরীর নিয়ে, এক মুখ কাশফুল
অনেক পথ ভেঙ্গে কোকিলের কুহু গান পৌছিল কানের ভিতরে
ধূসর মাঠ পেল সবুজ পাখা কোন দেবীর পারিজাত মন্তরে;
বারে বারে হৃদয় ঘা মারে দ্বার খোলে, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরি
এতদিন ডাঙা ছেড়ে গাঙের বুকে ভাসলো সোনার তরী।

বিড়ি

—অরুপ বৈদ্য

তামাক পাতাতে মোড়া,
ভিতরে মশলা ভরা।
ওহ, কি সুস্বাদু ভাই!
যাহারা পুড়িয়ে খাই।
এক টাকায় তিনটি বিড়ি,
ছাড়ো সব তাড়াতাড়ি।
যদি ধরে যক্ষ্মা,
কেহ পারে না রক্ষা।
যদি করো যুক্তি,
তবেই পাবে মুক্তি।

Cigaratte smoking is injurious to health.

শরৎ দিনের গান

—তিলক সুধর
(বি.এ. বাংলা সাম্মানিক, ১ম বর্ষ)

শরতের ঐ রঙের খেলা
নানান ছটার মেলা
নীল গগনের পলে পলে
সাদা মেঘের ভেলা।
কাশের বনে উদাস হাওয়ায়
শুনি কিসের গান,
শিউলি ফুলের সুবাসে মোর
মেতে ওঠে প্রাণ।
ঢাকের তালে ওই শোনা যায়
আগমনির পালা
মা এসেছেন শারদ দিনে
সাজাই বরণ ডালা।

আমরা ৬ জন

—টুয়া দে (রেশমা)
(বি.এ. সংস্কৃত বিভাগ, ২য় বর্ষ)

আড্ডা হাসি তর্ক মজা
আমরা ছ'জন মিলে।
পড়াশোনার ব্যাপারটাতে
আমরা সবাই ঢিলে।
ক্লাসের শেষে দুপুর বেলায়
আড্ডা মারার ধুম।
সন্ধ্যা হলেই মোদের চোখে
নেমে আসে ঘুম।
T.V. দেখা Chatting করা
এইতো হল কাজ।
পড়তে হলের মাথার উপর
ভেঙ্গে পড়ে বাজ।
ঘোরা ফেরা শুধুই ডেটিং
সময় পেলেই বাইরে ইটিং।
রোল, ফুচকা, চাউ, মোগলাই।
হাসি ছাড়া আর কিবা চাই।
এসব নিয়েই সুখের জীবন
ভালোই আছি আমরা ছ'জন।

তবুও কবি

—সুমন দে
(বি.এ. সংস্কৃত সাম্মানিক, ২য় বর্ষ)

নামটি আমার সুমন দে,
সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি
ম্যাগাজিনে লিখতে হবে
সেই ভাবনায় মরি।
ভাবলাম আমি -- যেমন তেমন
একটা লিখে দেবো,
আমার নামে ছাপা হবে
কী আনন্দ পাবো!
কলম নিয়ে শুরু করি
যা হোক কিছু লেখা,
নামী দামী হোক বা না হোক,
হবে কিছু শেখা।
বাবা বলেন, "পড়াশোনা কর,
লিখতে হয় না তোকে";
জেঠু বলেন, সে কী কথা,
উৎসাহ দে ওকে!"
হঠাৎ দেখি, মা যে হাজির
ব্যাগটি হাতে নিয়ে --
"চাল কিনে আন, নইলে কলেজ
যাবি কি ছাই খেয়ে?"
কবি হওয়ার শখ উড়ে যায়,
মনে শুধুই ভাবি --
গরীব ঘরের ছেলেরা কি
হয় কখনও কবি?

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান ভগবান করবে। এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছেন মাটির পৃথিবীতে।"
-- পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

সরি

— শান্তে আজমত মোল্লা
(গণিত সাম্মানিক ১ম বর্ষ)

মনে আছে,
মুসৌরি থেকে ফেরার পথে
দলের কামরা থেকে অন্য কামরায় গিয়ে
আমায় ভালবাসার প্রস্তাব দিয়েছিলে??

মনে পড়ে,
তোমার প্রতি আমার
প্রথমবার রাগের কথা??
কলেজে সবার সামনে হাত ধরে
বলেছিলে 'ভুল হয়েছে'।

মনে পড়ে,
সেই দিনের কথা?
যেদিন তুমি আমার
বুকে মাথা রেখে
হাতে হাত রেখে,
প্রণয়ের স্বচ্ছ আবেদন রেখেছিলে;
অপলক নেত্রে আমায় দেখছিলে,
আমি সেদিন তোমার অবাক হওয়া
দৃষ্টিতে পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।।

মনে নেই,
শীতের সেই দুপুরের কথা??
মন্দিরে, আমার মাথায় হাত রেখে
তুমি ভালবাসার অঙ্গীকার করেছিলে!
সেদিন তোমাকে পাওয়ার উদগ্র বাসনা
আমার বুকে আগুন জ্বেলেছিল।।

মনে আছে,
সেই শেষ দিনটার কথা??
যেদিন তুমি আমায় "সরি" বলে চলে গিয়েছিলে।।

সেদিন আমার প্রেমের, কল্পনার, চাওয়ার বাতি
দপ করে নিভে গিয়েছিল।।

তোমার ঐ ছোট্ট "সরি"
আজও বাজে আমার কানে,
আমার গিটারে, অবচেতন মনে, আজও বাজে
তোমার "সরি"র তান।।
মনের অজান্তে আজও "সরি" গান ভিড় করে,
লিখতে হাত অবশ হয়ে যায়,
মুখের ভাষা নীরব হয়ে যায়,
মনে পড়লে তোমার "সরি"র কথা।
কখনও গভীর রাত্রে একা বিছানায় শুয়ে,
তোমার "সরি"র স্বপ্ন দেখি।
তোমার ঐ ছোট্ট "সরি"
আজ তোমাকে আমার থেকে আলাদা করেছে,
আর আজ,
তোমারই ঐ ছোট্ট "সরি"
আমায় কবিতা লেখার ভাষা জুগিয়েছে,
আমাকে কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে।।

হারিয়ে যাব যেদিন আমি

— মার্জিনা সুলতানা
(১ম বর্ষ, সাধারণ)

হারিয়ে যাব যেদিন আমি
পড়বে আমায় মনে,
এক ফোঁটা জল আসতে দিস
তোর ঐ দুটি চোখের কোণে।
সেদিন আমায় যতই খুঁজিস
পাবিনা আমার দেখা,
চলে যাব দূরের দেশে
হয়ে যাব একা।
নীল সাগরের অতল জলে
দিয়ে দেব ডুব
চিরকালের জন্য সবাইকে
করে দিয়ে চুপ।
আকাশ পানে তাকিয়ে তুই
দেখবি যখন আমায়
চিরকালের জন্য আমি
নেব তোর থেকে বিদায়।
তোর ঐ হৃদয় থেকে চলে যাব
অচিন গাঁয়ের দেশে
আর কখনো থাকবো নারে
এই ভালোবাসার দেশে।
বলরে তুই বল
এক বারো তুই ডাকলি নারে
করলি শুধু ছল।
কী দোষেতে দোষী আমি
তোর হৃদয়ের মাঝে
আর কখনো আসবো নারে
আমি তোর সাঁঝে।
আমায় যদি ভাবিস মনে
হবি যে নাকাল হয়ে যাবি যে সামাল।
আর কখনো যদি আমায় মনে পড়ে,
আসব আমি আবার ফিরে
শুধু তোরে আপন করে,
শুধু তোরই মনের ঘরে।

অপেক্ষা

— সিরাজুল মল্লিক
(২য় বর্ষ)

সহসা হারিয়ে যাওয়া ঢেউয়ের মতো
মিলিয়ে গেলে তুমি।
বহুদিনের সম্পর্ক ছিন্ন হল শুধু,
ভয়ে হতাশায়, আর অবহেলায়,
বিলীন হয়ে গেলে তুমি
তবু আজও তোমার পথ চেয়ে বসে আছি
যদি আবার আসে কোনো এক শীতে,
হারিয়ে যাওয়া কোকিলা।
যদি ফুটে উঠে শুকনো গাছ থেকে
স্নিগ্ধ গোলাপ।
সমাজের দৃঢ় শিকল ভেঙে
যদি সাহস সঞ্চার করে বেরিয়ে আসে
আশার আলো এই আশা,
কঠিন বাস্তবে ভেঙে যায় স্বপ্ন।
উড়ে যায় তাসের ঘর
তবুও ধূলোয় পেতেছি সংসার।
অপেক্ষা শুধু তোমার।

চৈতন্যবাণী

—রুদ্রনীল মুখার্জী
(১ম বর্ষ)

সারা পৃথিবীর প্রভু তুমি, চৈতন্য মহাপ্রভু
তাইতো তোমার নামে আছে এতোই মধু।
করুণারই সিন্ধু তুমি পতিতের বন্ধু,
তাইতো তোমায় ভালোবাসে খ্রীষ্টান-মুসলমান-হিন্দু।
দরিদ্র মানুষকে তুমি করেছ প্রেমধনে ধনী,
তাইতো তোমার কাছে আমরা সকলেই ঋণি।
গৌরবর্ণ গৌরাঙ্গ তুমি সরিয়েছ বর্ণ বৈভব,
সেই মহিমায় আলোকিত পৃথিবীর শৈশব।
যখন পৃথিবীতে জাতি-ধর্ম সর্ব ভিন্ন,
তখন তুমি মর্ত্যভূমিতে হয়েছ অবতীর্ণ।
বঞ্চিত মানুষের প্রতি কাঁদে হৃদয় তোমার,
তোমার হৃদয়ে স্থান পায় মুচি-মেথর-কামার।
তোমার চরণে মাথা রেখে যেন বলি হরি হরি,
জীবনে তোমার কথা যেন অনুসরণ করি।
এই বলে আমার কথা করলাম সমাপ্ত,
সদাই যেন মানবসেবায় আমার হৃদয় থাকে লিপ্ত।

দুর্ভিক্ষের কথা

—আল্পনা শুঁ
(২য় বর্ষ)

জানিনা কবে কেটে গেছে ৭৬ এর মন্বন্তর -
তবুও কি সেই দিন ভোলা যায়?
আর ভুলবইবা কি করে, আমরা মানুষ, মানুষ হয়ে-
কি মানুষের স্মৃতি চারণার অধিকারটুকু আমাদের নেই?
আজও সেইদিন আমাদের মনকে নাড়া দেয়,
কি ভয়ানক ছিল সেই সব দিন।
ভাবলে ভয়ে ভয়ে কম্পিত হয়ে ওঠে আজও প্রাণ।
এক অসহায় বাবা তার পরিবারকে
দুটি অন্নও তুলে দিতে পারেনি।
এক মা তার সন্তানকে একফোঁটা-
নিজের দুধ পর্যন্ত খাওয়াতে পারেনি।
কারণ, সে নিজেই একজন অনাহারক্লিষ্ট।
তখন সেই মা হয়তো বলেছিলো মনের দুঃখে-
আয় বাছা, মোর কোলে।
তাইতো আজ আমরা শপথ নিয়ে বলতে পারি -
আজ আমরা সেইদিনকে করবো না ভয়,
করবো জয়।

"Those who are guided by noble thoughts, are never alone"
--Sir Philip Sydney

তুমি নেই

— বাপ্পা মাজি
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ)

নীরবে বসে থাকি
লাগে ভারি ফাঁকা,
তুমি নেই কাছে
মন বড়ো একা।

জানি না আজ তুমি
আছ কোন দূরে,
শুধু জানি আজও আছ
হৃদয় মাঝারে।

মাঝে মাঝে ভাবি বসে
কি অপরাধ,
কোন দোষে পেলাম
এত বড়ো আঘাত।

হারিয়ে যাবে যদি
বাসলে কেন ভালো,
কেনই বা দু-চোখে আমার
জ্বালালে প্রেম-আলো।

ভুলতে পারি না আজও
তোমার কথা
মনে পড়লেই প্রাণে লাগে
ভীষণ ব্যথা।

আজও পথ চেয়ে
বসে থাকি আমি,
এই আসছো এই আসছো
প্রিয়তমা তুমি।

ব্যর্থ আশা আমার
গুমরে কাঁদে,
স্মৃতি যেন নীরবে
পিছু পড়ে থাকে।

ভাঙা ঘরে আমি একা

— টুম্পা দে (রেশমা)
(সংস্কৃত সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

কিসেরই হরষে মনেরই পরতে
রক্তধারা ঝরে।
কিসেরই পরশে নিজেরই জীবনে
কালো মেঘরাশি ঘনে।
কেন যে জানি না মনেরই টানেতে
কখন যে কাকে চাই?
কেন মনে হয় পলে পলে সবই
ফেলেছি শুধু হারায়ে।
মনেরই মেঘেতে স্বপ্ন আমার
হয়ে গেল শুধু বৃষ্টি।
মাটিতে পড়িয়া সবই ধুয়ে গেল
হল না কিছুই সৃষ্টি।
স্বপ্ন আমার ভেঙ্গে গেল আজ
নেমে এলো মরু ঝড়
ঝড়েরই দাপটে উড়ে গেল সব
হয়ে যেন কুটো খড়।
জেদ রইল অটল তবুও
মনেতে বিঁধল শর।
পড়ে আছি শুধু আমি
আর ভেঙেছে আমার ঘর।

কোথায় তুমি?

—অভয় দাশগুপ্তা
(প্রাক্তন ছাত্র)

শ্রাবণের হওয়া বৃষ্টির মধ্যে, তুমি এলে হঠাৎ উত্তাল ঝড় হয়ে;
ক্ষণিকের জন্য হলেও, হয়তো সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিলে তুমি
দিয়েছিলে এই হতাশ জীবনে আশার আলো।
আমি কোনদিনই চাইনি আমার জন্য কষ্ট হোক তোমার,
তাই তো তোমাকে প্রথমেই বারণ করেছিলাম
কিন্তু হায়!
প্রথম প্রেমের আবেগে, তুমি ভালোবাসাকে দিয়েছিলে সবটুকু,
তারপর, নিজে থেকেই করতে শুরু করলে ছলনা .....
বললে আমাকে অনেক অনেক মিথ্যে কথা,
আর দিলে তোমার তৈরী এই নিষ্পাপ মনে বেদনা।
তারপর একদিন আশ্বিনের ঝড়ের মতো তুমি আবার চলে গেলে
রেখে গেলে আমার মনে কতগুলো জিজ্ঞাসা?

দাঁতাল হাতি

—রজীব ঘোষ
(প্রাক্তন ছাত্র)

রাতাবিরেতে জানলা পাশে
ওই দাঁড়িয়ে কে?
ঠাম্মা বলেন চোর নাকি রে -
দিস না সাড়া যে!
দাদু বলেন কে ওখানে?
সামনে দেখি আয়।
চুপটি করে তবুও সে
দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়।
জানলা ধারে চুপি সারে
দাদুর প্রিয় নাতি
গিয়ে দ্যাখে দাঁড়িয়ে আছে
মস্ত দাঁতাল হাতি।

ক্রোধ

—কাশীনাথ পাঁজা
(প্রাতঃ বিভাগ, দ্বিতীয় বর্ষ)

মানবের শত্রু যত আছে এ সংসারে,
ক্রোধসহ তুলনায় সকলেই হারে।
গুরু লঘু জ্ঞান লোকে ক্রোধেতে হারায়,
অশ্রাব্য কথা তার মুখে বাহির হয়।
আত্মহত্যা মহাপাপ তাও ক্রোধে হয়,
ক্রোধেতে বুদ্ধির নাশ, ক্রোধে কুলক্ষয়
এমন ক্রোধের বশ হয় যেই জন
উন্নতির আশা তার থাকে কি কখন?
অতএব বন্ধুগণ দৃঢ় কর মন,
ক্রোধের অধীন যেন হয়ো না কখন।

বিদায় বেলায়

—বীরেন ধাড়া
(তৃতীয় বর্ষ)

বিদায়ের দিন আসছে এবার
বিদায় নিতে হবে,
আশঙ্কাতে আছি মোরা
আসবে যেদিন কবে।
কেমন করে বছরগুলো
পেরিয়ে গেলাম হায়,
চাইলে কি আর বছরগুলি
ফিরে পাওয়া যায়।
চিনবে না কেউ জানবে না কেউ
রাখবে না কেউ মনে,
চলে যখন যাব মোরা
বিদায় বেলার ক্ষণে।
তৈরী হয়ে নিতে হবে
বিদায় বেলার শেষে,
জানিনা যে কোথায় মোরা
আবার যাব ভেসে।
কত মেলামেশার সাথে
জড়িয়ে আছে স্মৃতি,
রেখে যাব সবার তরে
শুভেচ্ছা আর প্রীতি।
ভুল কখনো হয়ে থাকলে
করে দিও ক্ষমা
বর্ষশেষে বিদায় নেব
স্মৃতিই থাকুক জমা।

বৃষ্টির স্বপ্ন

—জয় সাহা
(.....)

বৃষ্টির চেতনায় ঘুমিয়েছিলাম,
তখন বৃষ্টি হচ্ছিল।

বৃষ্টির শুন-শুন ধ্বনি
কানে আন্দোলিত হচ্ছিল বারংবার।

বৃষ্টির ঘ্রাণ বৃষ্টির স্পর্শ
আমার অবলুপ্ত চেতনাকে
পুলকিত করছিল শতবার।

জেগে দেখি -
কোথায় বৃষ্টি, কোথায় ভেজা আকাশের সজীবতা,
চারিদিকে কেবলই শুষ্কতা;

তাহলে কি -
এসব আমার কল্পনা-
স্বপ্নলোকের ঘোর?

হবে হয়ত -
স্বপ্নই ছিল-
স্বপ্ন হয়ে থাকে ঘুমন্ত চেতনার

তাহলে বৃষ্টি-
স্বপ্নে তুমি যতটা সুন্দর,
বাস্তবতায় নও।

রূপান্তরিত স্বপ্নভয়

— কাকলি রানা
(ইতিহাস সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

বিভোর হয়ে রঙ্গিন স্বপ্নভয় নিয়ে
তোমাকে দিয়েছি নতুন
তবু কখনো একাকি মগ্নতায় সিন্ধুতে
নীল পাতিহাঁস হয়ে যেতে চাই
কিম্‌বা অন্য কোনো বন্যতায়
অথবা নিরূপম নিরলস সভ্যতায়
যাই আমি ফিরে ফিরে বারে বারে
নীলে নীলে অম্বরে।

যেদিন রাত্রির বৃন্তছিঁড়ে একটা স্বপ্নভয়
আমাকে দিয়েছিলে তুমি
নতুন করে একটা জীবন যদিও
সমাধি মৃত্যুর অগেই।
তুমি রূপান্তরিত।

এখন দর্পনে অঙ্কন করি আমি আমাকে
খুশি মতো পথ চলি স্বপ্নভয় নিয়ে নয়
স্বপ্নের সাথে সাথে জীবনের পথে
নীলহাঁস পাতিহাঁস সব ভুলে গিয়ে
বন্যতা, অন্যতা, সভ্যতা সব ছিঁড়ে ফেলে
শুধু নীলে নীলে অম্বরে
নীল সমুদ্রের তীরে
আর স্বপ্নের সাথে সাথে স্বপ্ন ভয়ের প্রান্তরে।

শহীদ স্মরণ

— শেখ আব্দুল হোসেন
(বি.এ. সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

ভারত স্বাধীন করল যারা
মোদের চির বরণীয় তাঁরা।
স্মরণ করি তাদের মোরা
ইংরেজ প্রাণ কাঁপায় যাঁরা।
মহীয়সী ঝাঁসির রাণী
মোদের কাছে অমর তিনি।
ফাঁসির মঞ্চে দিলেন প্রাণ
ভগৎ সিং আর বীর ক্ষুদিরাম
নেতাজীকে কেউ ভুলোনা
এমন বীরের নেই তুলনা।
বিনয়, বাদল, দীনেশ নাম,
সকলকে জানাই প্রনাম।
একবিংশের স্বাধীন প্রভাতে
তাদের স্মরি পতাকা হাতে।
এসো সকলে শপথ নিন
শোধ করব তাদের রক্তঋণ।
তাঁদের ত্যাগের মন্ত্র জপিয়া
ঘুচবে আঁধার আসবে সুদিন।

নেশা

— মিলন ঘোষ
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ, প্রাতঃ বিভাগ)

নেশাই আশা - নেশাই ভরসা,
নেশাই আবার সর্বনাশা।
কাজের নেশা - ভালো নেশা
তৈরী করে ভবিষ্যৎ।
জীবনের আঁধার ঘোচায়
দেখায় যে আলোর পথ।
যাদের ভাই আছে নেশা,
নাটক - জুয়া - সিনেমা,
খরচের খাতায় তাদের
নেইতো কোন সীমা।
অনেকের আছে দেখি
লটারীর নেশা,
অল্প টাকায় ধনী হব,
এটাই তাদের আশা।
থাকে যদি নেশা কারও
আফিন - মদ - গাঁজা,
অল্প দিনেই বুঝে যাবে,
নেশার কি মজা।
যদি কেউ করে ভাই
ড্রাগ নেশা লীলা,
অচিরেই সাঙ্গ হবে,
তার ভবের খেলা।
বিড়ি সিগারেটের নেশা,
সবখানেই চলে
দেখিয়ে খায়, লুকিয়ে খায়
পাছে লোকে কিছু বলে।
চায়ের নেশা ভদ্রা নেশা,
কেউ করে না মানা,
এই নেশা ছেলেবুড়োর
সকলেরই জানা।
এই দুনিয়ায় সকল নেশা,
পাবে তুমি ভাই,
লেখাপড়ার নেশা দেখো,
কোনখানেই নাই।

ভেজাল

— প্রশান্ত নন্দী
(বি.এ. সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

ভেজাল সবই ভেজাল
ভেজাল মোদের যুগটা,
ইতিকথা লিখব বলে
নিলাম কাগজ পেনটা।
তেলে ভেজাল দেখি যে ভাই
লঙ্কা গুড়ার কাজটা,
চাল ভেজাল কাঁকর বালি
দাঁতে পড়ে বাজটা।
কেরোসিন তেলে ভেজাল
নিভে ঘরের বাতি,
রোগীর ঘরে ভেজাল ঔষধ
কাটো না তার রাতি।
উকিল ভেজাল মজুরী ভেজাল
ভেজাল ছাড়া কোনটা,
সবার চেয়ে বেশী ভেজাল
মানুষের ঐ মনটা।
এসব ভেবে বাগিয়ে কলম
ঘড়ির পানে দেখি,
নটার সময় ভেজাল ঘড়ি
বারোটা বাজে একি।
লিখতে গিয়ে ছিঁড়ি কাগজ
ভাঙ্গ নতুন নিবটা,
জলে স্থলে সবই ভেজাল
ভেজাল মোদের যুগটা।

বন্ধু

— প্রদীপ বাড়ুই
(বি.এ. তৃতীয় বর্ষ)

বন্ধু মানেই খেলার সাথী
একটু একটু রাগ।
বন্ধু মানেই সুখ দুঃখ
সমান সমান ভাগ।
বন্ধু মানেই জীবনসাথী
তার পথেই চলা।
বন্ধু মানেই জীবনতরী
আনন্দ স্রোতে বওয়া।
বন্ধু মানেই চোখের কোণে
একটুখানি জল
বন্ধু মানেই জীবন নদী
আনন্দে ভরপুর।
বন্ধু মানেই বন্ধু সাথে
একই পায়ে চলা।
বন্ধু মানেই সাহায্যের হাত
বাড়িয়ে দিয়ে চলা।
বন্ধুর জন্য এত খুশি
যৌবনে ভরপুর
তার মাঝে বাজবে
বন্ধুত্বের নূপুর।

কেন মোরে ডাক

— শুভরাজ ব্যানার্জী
(বি.এস.সি. সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

তোমায় দেখেছিলাম শরতের আগমনে,
বাতাসে উড়েছিল কাশফুল,
তেমনি দেখেছিলাম তোমার খোলা চুল।
উদাস হয়ে বসেছিলাম যখন,
শরতের ছোঁয়াতে মনে পড়ে গেল তোমাকে তখন।
চোখের পাতায় স্পর্শ করে চলে গেল যখন,
সেই যাওয়াতে বসে থাকতে মন মানে না এখন;
তোমার পায়ের নূপুরের শব্দ শুনে,
সারা দেশে তখন ঘুম ভাঙে।
এতদিন গিয়েছিলে কাছাকাছি,
শরতের বাতাসে কে যেন বলে যায় আমি তোমারই আছি
নতুন হয়ে অষ্টমীতে দেখা দিলে যখন;
বেলা শেষে শরৎ বলে হাতটা ধর এখন।

"Woods are lovely dark and deep
But I have promises to keep
And miles to go before I sleep
And miles to go before I sleep."

--Robert Frost

সিন্ধুর বিন্দু

— গিয়াসুদ্দিন সেখ

আমি একটা শিশিরের বিন্দু
তোমরা আমাকে অতি তুচ্ছ ভাবলেও
তবু আমি মোটেও তুচ্ছ নই।
আমি ভয়ানক ভয়ঙ্কর,
শঙ্করের নৃত্য তাণ্ডবী ঝংকার।
এইতো এইতো সেদিন -
বর্ষায় নদীর দুকুল ছাপিয়ে
আমি ফুলে উঠেছিলাম,
আর শুনছি কত ধিক্কার,
অসহায় মানুষের আর্তনাদ-হাহাকার -
গ্রাম শহর নিশ্চিহ্ন হল কত,
তবু আমি একটা বিন্দু।
আর তোমরা ভাবছ ক্ষুদ্র, তুচ্ছ।

সেটা তোমাদের হৃদয়ের।
সে বছর আমার অবর্তমানে
কত যন্ত্রণা তোমাদের দিয়েছি,
চারিদিকে খরা আর খরা
শুষ্ক হাহাকারের বন্যা।
সেদিন সবুজ মাঠেরা চেয়ে ছিল,
ফ্যাকাসে ভাবে, আর কাঠ ফাটা
সূর্যের হাসি।

চারিদিকে ক্ষুধা তৃষ্ণার বর্বরতায়
কেঁপে উঠেছিল কচি কিশলয়ের পাপড়ি।
তবুও ! তবুও আমায় বলবে তুচ্ছ।

আবার হেমন্তের প্রতিটি সকালে
মুক্তার মতো -
ঝল মল করি ঘাসের আগায়।
আবার কখনো,
শীতের জমাটি হিম - ভোরের কুয়াশা
কখনো বা বর্ষার ঝংকার বৃষ্টি।
ঝরে পড়ি হিমালয়ের বুক চিরে ঝর্ণাধারা।
তোমাদের আনন্দ উল্লাস, আমাকে ঘিরেই,
আমি তো শুধ এক ফোঁটা শিশিরের বিন্দু নেই।
ফোঁটা ফোঁটা বিন্দু একসাথে সিন্ধু।
সমুদ্র থেকে বেলাভূমির দিকে
তাকিয়ে থাকে উদাস মনে।
কত গ্রাম, কথ শহর
কত মানুষের মন তোলপাড় করি
কারণ, আমি একটা শিশির বিন্দু।
তবুও তোমরা আমায় বলবে তুচ্ছ, ক্ষীণ।

"মানুষের মধ্যে যে পূর্ণতা স্বতই বর্তমান, তাহারই বিকাশের নাম শিক্ষা।"

-স্বামী বিবেকানন্দ

আমার প্রিয় গান

— আকাশ সাহা

শীতের সকাল কুয়াশা ঢাকা
ঘুম ঘুম আঁখি দুচোখ মাখা।
কখন যেন আকাশ জুড়ে
উঠল রবি, মিষ্টি সুরে,
গেল গেল প্রভাত পাখী
প্রভাতী সুরের গান।
ছলছল আঁখি দুচোখ মাখা
নামলো কুয়াশা চাদর ঢাকা
চিনলো না সে রবির আঁকা
শিশির কণার গান।
আধো আলো পায়ে এগিয়ে চলে
রোদছবি তার মাখা গায়ে।
সুর যেন তার সাথে চলে
আমার হৃদয় প্রাণ।
যে যে ছিল আমার সাথী
আমার প্রিয় গান।

ম্যাগাজিনের ডাকে

— সুমিতি কর্মকার

(বি.এস.সি. সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

ম্যাগাজিনের সময় এলে,
লেখা ভাবি কিছু,
কলম নিয়ে লিখতে বসি
ঘাড়চি করে নীচু।
কোথায় ছড়া কোথায় ছন্দ
খুঁজতে থাকি যত,
বিরক্তিতে মনটা আমার
ভাবতে থাকে তত।
একটা ধরি একটা ছাড়ি
মিল পাই না কোন,
মনের দুঃখ মনেই থাক, বলার কিছু নাই,
লেখার জন্য লেখা শুধু, প্রতিভা কিছু নাই।
দুঃখ আমার ঘুচবে যদি,
পত্রিকায় স্থান পাই।

সুনামি

— রিন্টু ঘোষ

(সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

সুনামি শুধু এলোমেলো নিলো সে কত প্রাণ,
সমুদ্রেরই তীরে তীরে কান্নার সারিগান।
কত যে জীবনের প্রাণ হারাল আলয়েতে বসে বসে,
সুমুদ্রের জলেতে সুনামি এলো ধেঁসে ধেঁসে।
সমুদ্রের ত্রিশ ফুট উঠল সেজে জল,
পাশাপাশি অঞ্চলেতে থর থর কংাপে স্থল।
মৎস্যরা সব সমুদ্রেতে মরল কাছাড় খেয়ে,
প্রতিবেশীর ঘরগুলো সব পড়ল সমুদ্রে ধেয়ে।
মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল লাখেরও বেশী
এজন্য পুরোপুরি ভগবানই দোষী।
সুনামির তাণ্ডবে মানুষ তার পরিবার ছাড়া হয়,
মৃতদেহগুলিকে সমাধিস্থালে গণকবর দেওয়া হয়।

বৃষ্টি

— বলরাম ভট্টাচার্য্য
(বি.এস.সি. সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

বৃষ্টিরে তুই আয় নেমে আয়,
আমার ঘরের চালে,
কচুপাতা, ছাতিমতলা, কদমফুলের ডালে।

বৃষ্টিরে তুই আয় নেমে আয়,
মায়ের আঁচল ছুঁয়ে,
জুঁই, মালতী, চম্পাবতী, তুলসীতলা ধুয়ে।

বৃষ্টিরে তুই আয় নেমে আয়,
এই পৃথিবী বুকে,
ফাটল বেয়ে ধীরে ধীরে যাবিরে তুই ঢুকে।

বৃষ্টিরে তুই আয় নেমে আয়,
চাষের জমি বেয়ে,
প্রবল বেগে নদীর দিকে যাবিরে তুই ধেয়ে।

বৃষ্টিরে তুই আয় নেমে আয়,
নানা ছদ্মবেশে
লালপরী, নীলপরী, রুপকথারই দেশে।

আমাদের কলেজ

— কাঞ্চন দাস

আমাদের নতুন কলেজ
নতুন নতুন ঘর,
থাকি সেথা সবে মিলে
নাহি কেহ পর।
বড় বড় ছেলেমেয়ে
পড়িবার কালে,
কাঁধেতে ব্যাগ নিয়ে
তারা সব আসে।
সকাল বিকালে কভু
ক্লাস হলে পরে,
তাড়াতাড়ি করে তারা
চলে ক্লাস ঘরে।
চুপচাপ নোট লেখে
পড়াগুলো শোনে,
সেই পড়া ঘরে এসে
করে এক মনে।
সবুজ সবুজ ঘাস দিয়ে
মাঠের মাটি ঢাকা,
মাঝখানে ছোট বাগান
ফুলে ফুলে রাঙা।
কিচিমিচি করে সেথা
ছাত্র-ছাত্রীর ঝাঁক,
কেউ কেউ জোর করে
দেয় শুধু ডাক।
কেউ আনে সাইকেল
কেউ আনে গাড়ি
ক্লাসগুলি সারা হলে
যায় তারা বাড়ি।

নেতা

—তন্ময় পালিত

বোঝে না যারা
জনগণের ব্যথা;
হৃদয়ে যাদের নাহি-
স্নেহ ভালোবাসা;
পরের দুঃখে--
নাই যাদের কাতরতা;
পরের বিপদে --
দেয় না যারা সাড়া;
বল না তাদের,
জনগণের নেতা।
পরের দুঃখে ভরে যায় যাদের,
নয়ন দুকুল;
হৃদয় বাজে যাদের ফোটে--
প্রেমের মুকুল।
তারা কভু হয় না গো,
জনগণের চক্ষুশূল।
তাদের নেতা বলিতে-
কর না কভু ভুল।
সবারে আহার দানি
যিনি খান শেষে,
আপনারে বিলায়ে-
যিনি রন হাসিমুখে
তাদের নেতা বলো চিরদিনে।
অপরে সুগন্ধ দানি ধূপসম যারা পোড়ে--
তারাই নেতা রূপে;
জগতে বিরাজে।

পাখা ও আলো

—আকাশ ধাড়া (বীরেন)
(বি.এ. ৩য় বর্ষ)

গরমকালে দুপুর বেলা
পাখা বলে আলো
দিনের বেলা তাকিয়ে থাকিস
মুখটি করে কালো।
সকাল থেকে দিন পেরিয়ে
নামলে পরে রাত
তবেই তোকে জ্বালবে বলে
মানুষ বাড়ায় হাত।
আমায় কিন্তু দিনে রাতে
সব সময়েই চাই
আলো তোদের রাত্রে ছাড়া
দরকার তো নাই।
দেখতে দেখতে ক' মাস যেতে
যেই নামে শীতকাল
আলো বলে পাখা রে তোর
দ্যাখ না কি হয় হাল
শীতের রাতেও আলো ঠিকই
জ্বলতে থাকে ঘরে
হেঁট মুণ্ডু পাখা তখন
খুব লজ্জায় মরে।

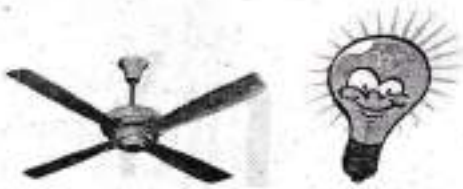

গভীরে

—অতনু গরাই
(বি.এ.-তৃতীয় বর্ষ)

তোমাকে ডাকি প্রিয়তমা বলে কণ্ঠ ফাটিয়ে দুরন্ত মনের গভীরে
বারবার কাছে গিয়েও বলতে পারিনি ভালোবাসি, বলেছি শুধু অন্তরে
সে ডাক হয়ত তুমি শোননি বোঝনি চোখের মানে
এসেছো কাছে ধরোনি হাত জল দেখনি চোখের কোণে
তাই আসত শুধু আমার দিকে তোমার দিকে নয়
তুমি আছো আমার প্রেমে আমি কি নাই তোমার চাওয়ায়
তুমি কি শুধু দূর থেকে হাসবে আমার চোখের জলে
ভাসবো আমি তোমার প্রেমে চাই তোমার অন্তরালে
ব্যাকুল হয়ে চাইবো তোমায় কাঁদবো আমি আকুল হয়ে
থাকবে তুমি অনেক দূরে থাকবে আমার মনের হয়ে
বাঁচবো তোমায় ভালোবেসে চাইবো তোমায় নিজের মনে
তাইতো তোমায় দেখার আশা গোপনে মনের কোণে।

"ছাত্রদের মধ্য হইতেই ভবিষ্যতের মনীষী ও রাষ্ট্রবিদ্‌গণের উদ্ভব হয়। ভারতবর্ষের ছাত্রেরা যদি রাষ্ট্রীয় কর্মে যোগদান না করে, তবে কর্মীই বা পাওয়া যাইবে কোথা হইতে এবং তাহাদের শিক্ষাই বা হইবে কোথায়?"

-নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু

পার্থেনিয়ামের খোঁজে এক আত্মগবেষক নেতাজিনগরে

— শচীন্দ্রনাথ কুমার
(প্রাক্তন অধ্যাপক - সোনামুখী কলেজ)

পার্থেনিয়াম এই সুমিষ্ট নামের পিছনে লুকিয়ে আছে নীরবে সংক্রামক এক বিষ
সমাজে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আজ মহত্বের পিছনে তেমনি সর্বনাশা হদিস।
পার্থেনিয়াম কি শুধুই গজিয়ে উঠেছে হেথা হোথা অফিসের অলিতে গলিতে?
একটু তাকালেই দেখা যাবে বিষবৃক্ষ সম বীজ কেমন রয়েছে ফুলের কলিতে।
সাধারণের অজ্ঞতাতেই যেমন অলি গলির মধ্যে পার্থেনিয়ামের বাড় বাড়ন্ত,
তেমনই অজ্ঞতা বা সরল বিশ্বাসের সুযোগে বিষবৃক্ষ হাতে নিয়ে কত সামন্ত।
বোকা মানুষ বুঝতে পারেনা তাদের ধরতে কেমন পাতা অছে জোচ্চুরির ফাঁদ,
সামন্তদের স্তোকবাক্য একটা ফাঁদ কেটে বাহির হলে বুঝবে কেমন আর্তনাদ।
সামন্ত মশাইরা সহজ অঙ্কে বোঝাবে কেমন করে দুয়ে দুয়ে মিলে হয় পাঁচ,
তাদের কথার মারপ্যাঁচে চার কেমন করে হবে পাঁচ পাবে না তার আঁচ।
টপ টু বটম এখন দেখা যাচ্ছে বিষবৃক্ষের ফাঁদ পাতা কেমন মোক্ষম জাল,
সেই জাল কেটে বাহির হতে হাজার চেষ্টাতে ব্যর্থ হয়ে হবে শুধু নাকাল।
অফিসে, আদালতে জনগণের সেবক সেজে সংস্কারক পদে রয়েছে আজ যারা,
তাদের আমুল সংস্কার না করলে বড় বড় পার্থেনিয়ামরূপ বৃক্ষ সৃজিবে তারা।
বিষবৃক্ষ নিধন যজ্ঞে আহ্বান করিয়াছি সোনামুখীর সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিককে,
তার উন্নয়ন সীমার গণ্ডিতে হাতের নাগালেই তিনি খুঁজে পাবেন যথেচ্ছাচারিকে।
এখন মানুষের কাছে বিচার চেয়ে যদি না পাই কোন সুবিচার বা প্রতিকার
তবে ঝাড়ে বংশে বিষবৃক্ষ নিধনে খুব শীঘ্রই প্রকৃতির ঝড় করবে সুবিচার।

"Education is the process of living through a continuous reconstruction of experiences. It is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfil his possibilities."

-- John Dewy.

মৃত্যু

— মধুমিতা ঘোষ
(বাংলা সাম্মানিক-বি.এ. ১ম বর্ষ)

বন্ধু, মৃত্যু তোমায় এমন কি দিতে পারে
যা আমি তোমায় দিতে পারি না,
ও কি পারে, আমার মতো করে তোমায় বুঝতে!
ও কি পারে, আমার মতো করে তোমার গান গাইতে!
ও কখনোই পারে না, আমার মতো করে
তোমায় ভালোবাসতে।
বন্ধু, ও কি পারে, তোমায় সেই অনুভূতি দিতে--
শুধু আমার ছবি আঁকে তোমার মনের ক্যাম্পাসে?
ও কি পারে, আমার মতো করে তোমায় নতুনভাবে ভাবাতে....
নতুন করে ভালোবাসতে শেখাতে?
ও কখনোই পারেনা আমার মতো করে
তোমায় ভালোবাসতে।
বন্ধু, ও কি পারে, তোমায় এমন অনুভূতি দিতে
যা বৃষ্টির দিনেও দেয় তোমায় রোদের উষ্ণতা!
তাও তুমি ওকেই ভালোবাসো।
হয়ত অনেক কিছুই পারে, যা আমি পারি না.....
আর তুমি যাকে ভালোবাসো, তাকে না ভালোবেসে
.....আমি কি থাকতে পারি.....
তাই তোমার চেয়ে অনেক আগে অনেক বেশি
ওকে ভালোবেসেছি যে আমিও।

"আমাদের দেশের বিদ্যানিকেতনকে পূর্ব-পশ্চিমের মিলন নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিবর্ণ স্বাধীনতা দিবস

—আবদুল্লা হক মিস্ত্রী (বাবু)
(বাংলা সাম্মানিক-বি.এ. ৩য় বর্ষ)

আজ এক স্মৃতিমধুর দিন, সকাল থেকেই মনটা বড় হালকা
তবে আচ্ছন্ন সেই হতাশায়।
আজ একটা প্রশ্ন বড় উঁকি দিচ্ছে, আমরা কি মুক্ত?
আমরা কারা? কিসের জন্য মুক্ত আজ?
শুধুই পথের দিকে চেয়ে
বসে থাকা ভাবীকালের অপেক্ষায়--
শুধুই হিসাব নিকাশ করা ভারসাম্যের, আর
দিন গোনা ভবিষ্যতের প্রত্যাশায়;

আমরা কী বুঁদ হয়ে থাকবো বঞ্চিতের সঙ্গীতে,
দুঃখ বেদনার রস-সন্ধানের আমেজে?
দুর্নীতির আবদ্ধে, শাসকের বাহুবলে দেশ আজ নিরুত্তর।
এই দেশের বৃহৎ অবস্থানেও মাথা গুঁজে থাকতে হয়
এক বড় অংশকে শুধু বাঁচার অভিলাষে
দুর্ভিক্ষের জ্বালা, সবলের অত্যাচার, বন্যার প্রকোপ
কি করে বাঁচবে মহামূল্যবান প্রাণ?
আজ আমরা মুক্ত, তাই বড় উৎসবের সঙ্গে
পালন করি এই মহান মুক্ত দিবস।
তবু আজও এই ভাবনা পেছন ছাড়ে না, যে
'আমরা সত্যিই মুক্ত তো?'

স্মৃতি ঘেরা জীবন

– ঋক্তিতা দাস
(ইতিহাস বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ)

সাতদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে, সারাদিন একটা গুমোট ভাব, আকাশ যেন সবার উপর রাগ করেছে, সূর্যটা যেন সকলের সাথে আড়ি নিয়েছে। তাই তুলিরও ভালো লাগছে না। ওর মনটাও কি রকম একটা ভারাক্রান্ত উদাসীন। Final Exam.ও শেষ, পড়াশুনাও নেই। তাই তুলি সারাদিন একা ঘরে বসে কি করবে বুঝতে পারছে না। পড়াশুনা থাকলে হয়তো সারাদিন পড়াশুনা করেই কাটিয়ে দিত। ওর এই রকম মেঘলা দিনে পড়তে খুব ভালো লাগে। যে কটা গল্পের বই, ম্যাগাজিন বাড়িতে ছিল সবকটা পড়ে শেষ করে দিয়েছে। আঁকতেও ভালোবাসে কিন্তু এই বৃষ্টির দিনে কি আর আঁকবে! যে কয়েকটা আঁকা আগে শেষ হয়নি সেগুলো শেষ করে দিয়ে আর আঁকতে ভালো লাগছে না। তাই তুলি নিজের Room এর নদী দিকের জানালাটাতে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার কথা, স্কুল জীবনের কথা, বন্ধুদের সাথে টিফিন, অফ পিরিয়ড়ে আড্ডার কথা ভাবতে লাগল। ক্লাস অফ থাকলে কি হাসি মজাটাই না করত তা বলবার নই। সবরকম বদমাইশের মূল ছিল তুলি তারজন্য স্যারদের কাছে খুব বকাও খেত। তাই তুলি Miss করে স্কুলের সেইসব দিনগুলো। আর এইসব ভাবতে ভাবতে বন্ধুদেরকে খুব Miss করতে লাগল। সবাই আজ নিজের নিজের কেরিয়ার গড়ে তুলতে ব্যস্ত। এইসব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল Album টার কথা, তাই তাড়াতাড়ি ড্রয়ার থেকে Album টা বের করে একমুখ হাসি নিয়ে বিছানার উপর বালিশটা নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে Album-এর পাতাগুলো উল্টাতে লাগল। ওই অ্যালবামটা তুলির খুব প্রিয়, যত মন খারাপ করুক না কেন এই অ্যালবামটা সব মন খারাপ দূর করে দেয়। পাতাগুলো উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল ওর Best Friend দের Group Photo টা। ওই পাতাটা বেরোতেই থমকে গেল তুলি কারণ ওই Album টাতে ছিল দ্বীপ। হ্যাঁ দ্বীপ, সেই দ্বীপ যে দ্বীপ ছিল তুলির Best Friend, যার সাথে তুলি তার স্কুল জীবনে খুব মজা করেছে। তুলি আর দ্বীপের বন্ধুত্বের কথা সবাই জানতো। সেই দ্বীপ আর তুলি -

যেই স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে কলেজের গণ্ডীতে পা রেখেছে তখনই দ্বীর আর তুলির বন্ধুত্বটা আরও গভীর হয়ে আবদ্ধ হয়ে গেল এক পবিত্র প্রেমের বন্ধনে। তারা প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হলেও তাদের প্রেমে ছিল সেই পুরোনো বন্ধুত্বের স্পর্শ, তাদের মধ্যে ছিল সেই আগের মতো ঝগড়া, খুনসুটি, একে অপরের ব্যাগের জিনিস চুরি করা, তুলি তার জীবনে প্রথম ভালোবাসা পেয়ে খুব আনন্দেই দিন কাটাতে লাগল। প্রতিদিন দ্বীপ তুলিতে নতুন নতুন স্বপ্ন দেখাতে লাগল, তুলি স্বপ্ন দেখতে খুব ভালোবাসে, তাই দ্বীপের দেখানো স্বপ্নগুলো নিয়ে খুব খুশি। তুলি সারাদিন পড়াশুনা আর দ্বীপের দেখানো স্বপ্নগুলো নিয়েই দিন কাটিয়ে দেয়। সে একবারও ভাবেনি স্বপ্ন স্বপ্নই তা কখনো সত্যি হয় না। জানিনা তখন দ্বীপ তুলির মেহেন্দির আঁকা ছবিতে কি দেখেছিলো, কি অনুভব করেছিল চোখের ভাষায়

যা তারে তুলির আঁকা মেহেন্দিতে, চোখের ভাষায় ছিল না। তাই দ্বীপের মন আর তুলির কাছে আবদ্ধ থাকতে চাইনি। ছুটে চলে যায় এক নতুন প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে। তুলি জোর করে দ্বীপকে আটকে রাখতে চায়নি কারণ সে জানে সবকিছু জোর করে পাওয়া গেলেও ভালোবাসা জোর করে পাওয়া যায় না। তাই দ্বীপের ভালোবাসাকে মুক্তি দিয়েছিল। অনেকদিন পর তুলি জানতে পারে তার ছেড়ে যাওয়া দ্বীপের মুক্ত বালোবাসা বাঁধা পড়ে গিয়েছে তারই পাশের গ্রামের তারই স্কুলে পড়া এক ছোট্ট বোনের কাছে। তুলি প্রথমে এটা বিশ্বাস করতে পারেনি পরে জানতে পারে এটাই সত্যি। তুলি তখন খুব কষ্ট পেয়েছিল। সে শুধু একবার জানতে চেয়েছিল তার ভুলটা কি ছিল? কিন্তু তার উত্তর তুলি পাইনি। সবজানার পরেও তুলি প্রার্থনা করেছিল তার প্রথম ভালোবাসার মানুষ দ্বীপ যেন ওই ছোট্টা বোনটাকে নিয়ে খুব ভালো থাকে। তাকে যেন আবার তার মত কষ্ট না দেয়। নিজেকে তুলি সান্ত্বনা দেয় এটা বলে যে, তার নিজের ভালোবাসা দিতে পারে নি, তাই দ্বীপ তাকে ছেড়ে অন্যজনের কাছে চলে গিয়েছে তাই এটা তার নিজের দোষ। দ্বীপকে তুলি তাই আস্তে আস্তে ভোলার চেষ্টা করতে লাগল। তুলি পরে পরে আরও জানতে পারে যে, দ্বীপ আর আগের দ্বীর নেই, দ্বীপ একেবারে বদলে গিয়ে অন্য দ্বীপ হয়ে গিয়েছে। আরও জানতে পারে যে দ্বীপ তুলিকে ভালো বেসেছিল বন্ধু দের সাথে Challenge নিয়ে, মন থেকে একদিনের জন্যও ভালোবাসেনি। প্রতিদিন অভিনয় করেছিল। তুলি খুব কেঁদেছিল এই ভাবে যে তার Best Friend, তার প্রথম ভালোবাসার মানুষের স্বরূপটা এই রকম! তাকে তুলি চিনতে পারেনি!

তার পর অনেকগুলো বছর কেটে গিয়েছে তুলির পড়াশুনাও শেষ, শুনেছে দ্বীপও একটা চাকরি পেয়ে নিজের কেরিয়ার তৈরী করে নিয়েছে। আজ তুলি অনেক বড়ো হয়ে গিয়েছে। Maturity এসেছে, সে আজ বুঝতে পারে ভগবান যা করে ভালোর জন্য করে। কারণ তুলি এইরকম বিশ্বাসঘাতককে ঘৃণা করে। আজ তুলি ভুলেও দ্বীপের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। তুলি জানে মানুষ কতটা খারাপ মনের হলে একটা মেয়ের সরলতা, বিশ্বাস, পবিত্র ভালোবাসার মনকে ঠকাতে পারে। জানো তোমরা আজ তুলি নিজেই নিজের জন্য দুঃখ করে কারণ সে তার প্রথম ভালোবাসার পবিত্র ফুল ভুল করে দ্বীপের মতো একটা ছেলের চরণে রেখেছিল! .....

তুলি থমকে যাওয়ার পর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে অ্যালবাম এর পাতাটা উল্টিয়ে উল্টিয়ে পরের ছবিগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ ঘড়িতে দুপুর বারোটার ঘণ্টা বেজে উঠল, তুলি তখন তাড়াতাড়ি অ্যালবামটা বন্ধ করে নীচে ছুটে গেল, এই যা! বারোটা বেজে গিয়েছে স্নান করতে হবে তা হলে মায়ের কাছে বকা খেতে হবে যে।

"যাকে আশা করি তাকে যতখানি পাই, আশা পূর্ণ হলে তাকে আর ততখানি পাই না। অর্থাৎ চাইলে যতখানি পাই পেলে ততখানি পাই না।"

-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দুই বন্ধুর কথা

– সৌমিতা ব্যানার্জী
(দর্শন সাম্মানিক, প্রথম বর্ষ)

গ্রামের নাম পলাশপুর। সবুজ মাঠে ঘেরা এই গ্রাম শহরের ব্যস্ত জীবনের থেকে অনেক দূরে। গ্রামের মাঝখান হয়ে বয়ে চলেছে রূপসা নদী। সারাক্ষণ পাখির ডাকে মুখরিত হয়ে থাকত এই গ্রাম। যেমন নাম তেমনি গ্রাম, ফুলের মতন সুন্দর। আর সবচেয়ে সুন্দর ছিল এই গ্রামের দুই শিশু যেন হীরে-মাণিক, একজন রাজ আর অন্যজন তমাল। রাজ ছিল হিন্দু, সে জন্ম থেকেই থাকত মামার বাড়িতে আর তমাল ছিল মুসলিম। ওদের বয়স তখন দশ। তারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভর্তি হয়। তারা এতদিন পর্যন্ত একই সঙ্গে স্কুলে যাওয়া, বাড়ি আসা, খেলা করা, দুষ্টুমি করা, একে অপরের বাড়ি যাওয়া-আসা এভাবেই কাটিয়েছে। এবারেও এর ব্যতিক্রম হল না। নতুন স্কুল, নতুন নতুন বন্ধু। রাজ ছিল পড়াশোনায় খুব ভালো। কিন্তু তমাল সেভাবে পড়াশোনা করত না। রাজ তমালকে পড়াশোনায় খুব সাহায্য করত। কিন্তু তমাল ছিল অমনোযোগী। রাজ যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করত তমাল-এর দুষ্টুমি বুদ্ধি তখন যেন প্রখর হয়ে উঠত। এইভাবেই কেটে যায় পাঁচ বছর। ওরা একাদশ শ্রেণীতে পদার্পন করে। কিন্তু ওদের পড়াশোনার বিভাগ আলাদা হয়ে যায়। রাজ ভর্তি হয় বিজ্ঞান বিভাগে আর তমাল ভর্তি হয় কলা বিভাগে। কিন্তু তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে কোন ফাটল ধরেনি। তারা আগের মতই রইল। স্কুলের অন্যান্য বন্ধুরা তাদের বন্ধুত্বের জোর দেখে হাসত। কারণ তারা ওদের মত সরল ছিল না। কিন্তু তারা কখনোই তাদের হাসিকে পাত্তা দেয়নি। একবার বাংলা ক্লাসে শিক্ষকমশাই তাকে কঠোর শাস্তির জন্য ডেকে নিয়ে যায়। তখন রাজ আর তমাল একসঙ্গে শিক্ষক মহাশয়কে বুঝিয়ে শান্তি মকুব করে দেয়। তারপর থেকে স্কুলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা রাজ আর তমাল-এর সাথে খেলা করত একসঙ্গে থাকত। এইভাবে হাসি-হুল্লোড়, দুঃখ-বেদনা পড়াশোনা করতে করতে কেটে যায় একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয়। ফল প্রকাশের দিন আসে। রাজ খুব ভালো নম্বর পায়, কিন্তু তমাল ভালো নম্বর না পাওয়ায় সে খুব ভেঙে পড়ে। কিন্তু রাজ কোন অহংকার না করে একসঙ্গে হাত ধরে বাড়ি ফেরে, রাজ তাকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। তমাল তার সিদ্ধান্তে অটল রইল। তারপর একদিন রাজের বাবা আসে তাকে তার বাড়ি কলকাতা নিয়ে গিয়ে ভালো কলেজে ভর্তি করবার জন্য। কিন্তু রাজের সাথে পলাশপুরের যেন হৃদয়ের সম্পর্ক, তাকে কিছুতেই সে ছাড়তে চায় না। তমালকে ছেড়ে রাজ যেন সাথীহারা হয়ে যাওয়ার মত হয়ে পড়ে। তমাল, রাজের চলে যাবার কথা শুনে একাকী মনে নদীর ধারে বসে থাকে, রাজ সেখানে গিয়ে তমালের সাথে শেষ কথাবার্তা বলে সে চলে যায় কলকাতা, সেখানে সে কলেজে পড়াশোনা শুরু করে। এদিকে তমাল সারাদিন গ্রামের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়ায়। একাকী মনে কোথায় যেন সে হারিয়ে যায়। রাজ নতুন কলেজে গিয়েও পলাশপুর আর তমাল যেন তার সারা মন জুড়ে বসে আছে। এইভাবে কেটে যায় আরো সাত বছর। রাজ পড়াশোনা শেষ করেছে। চাকরিতে যোগ দিয়েছে। সে শিক্ষকতার

চাকরি পায়, সে এখনো সেই আগের মতই আছে। শুধু তার পরিবর্তন ঘটেছে শারীরিক দিকে, মানসিক দিকে খুব কম। সে এখনো জাত পাতে অবিশ্বাসী এক সরল প্রকৃতির সাবালক। এর মধ্যে তমালের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। সে ভালো-মন্দ বুঝতে শিখেছে। সে সারাদিন লাঙল চালিয়ে মাঠে ফসল ফলায়। আর মাঝে মাঝে পুরোনো বইপত্র ধুলো ঝেড়ে আবার যত্ন করে তুলে রাখে। আর মনে উদয় হয় পুরোনো স্মৃতিগুলো। রাজকে যেন পলাশপুর ছাড়তে চায় না, তাই সে পলাশপুরের স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্য আবার সেখানে ফিরে আসে। রাজ সেখানে এসে সবার প্রথম তমালের বাড়িতে যায়। সেখানে তার খোঁজ করলে সে উত্তর পায় যে তমাল তাকে ছেড়ে, আত্মীয়-স্বজনদের ছেড়ে একবছর হল চলে গেছে। তমাল হৃদরোগে মারা গেছে। এই শুনে রাজ কান্নায় ভেঙে পড়ে। তারপর একদিন সবার অলক্ষ্যে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। যে পলাশপুরকে সে এত ভালোবাসত সেখানেই তার মৃত্যু হল। তারপর রাজ আর তমাল রাতের আকাশে পাশাপাশি দুটি উজ্জ্বল তারা হয়ে জ্বলতে থাকল। আবার মিলন হল দুই বন্ধুর। এই কি তাহলে আসল বন্ধুত্ব?

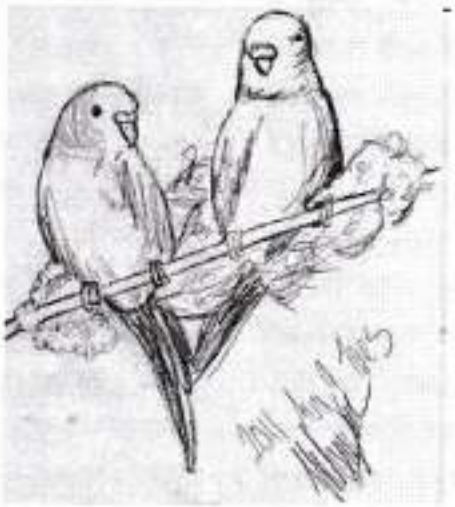

আমরা বিধাতার নিকট এই বর চাহি, আমাদের ক্ষুধার সহিত অন্ন, শীতের সহিত বস্ত্র, ভাবের সহিত ভাষা, শিক্ষার সহিত জীবন কেবল একত্র করিয়া দাও।

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রুকমনি

— মন্দিরা দেলাই
(বি. এ. তৃতীয় বর্ষ)

টুনটুনি -- পাখি নয়, রুকমনির পোষা বিড়ালটার নাম। পোষা বললে ভুল বলা হয়। আসলে টুনটুনির জ্ঞাতি ভাই-বোনেরা যখন কেউ কুকুরের পেটে অথবা বুদো গয়লা-র লাঠির চোটে ভবলীলা সাঙ্গ করে পরলোকে চলে গেল - তখনই রুকমনি ওকে সঙ্গে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিল। সাতসকালে বিড়ালবাচ্চাটার সাথে মেয়েটাকে দেখে বাপটাও উঠল তেলে-বেগুনে জ্বলে।

-- ক্যান এ-টারে বাসায় আন্‌লি। যা বার কইর‍্যা দে আয়। চাইর জনের প্যাট-ই ভরাতে পারি না, আবার বেড়াল বাচ্চা। শখ কত?

-- আম্মা আবুরে কও না, ইহারে আমি রাখুম, দ্যাখ্‌সো না ক্যামন পায়ে পায়ে ঘুর্‌তাসে, আর মা মা কর্‌তাসে।

-- আহা মাইয়্যাটা যখন কাছে রাখনের লেইগ্যে ঝোঁক ধরসে ....

-- তুই চুপ কর হারামজাদী। তোর লেগ্যেই ওর বাড় বাড়সে। মাইয়্যাটার মাথা চিবানো ছাইড়্যা তোর কোনো কাম নাই, আসকারা দিয়া দিয়া মাথায় তুলছোস্।

-- আব্বু, আম্মারে বক্‌বা না কয়ে দিচ্ছি, যা কহনের আমারে কও। আমি বাচ্চাটারে রাখুমই রাখুম। তোমারে দ্যাখ্‌তে হইবো না।

-- দ্যাখ্‌তো হইবো না-তাইলে তো বাইচ্যা যাইতাম। হাড়ে আমার বাতাস লাগ্‌তো।

-- সক্কাল বেলায় চ্যাঁচাইয়া আর লোক হাসায়ো না। পাড়ায় তো মেলা মাইনষ আছে। কায়রে তো তোমার লাখ্যান চ্যাঁচাইতে দেখি না। যাও-যাও মেলা কাম আছে, কর্‌বা যাও।

-বলেই রুকমনির আম্মা ঝুড়িতে কাপড়-চোপড় কুড়িয়ে দীঘিতে নাইতে চলে গেল। ওর আব্বাও রোজকার মত চেঁচাতে চেঁচাতে কুড়ুল হাতে বেরিয়ে গেল।

রুকমনি স্কুল থেকে ফিরে চুপি চুপি রান্নাঘরে ঢুকল। দেখল, কড়াইতে সামান্য পরিমাণ দুধ আছে। এক ঝিনুকবাটি দুধ তুলে নিয়ে সমপরিমাণ জল ঢেলে একছুটে বেরিয়ে গেল। টুনটুনিকে নিজের কোলে তুলল। সারাদিন বেচারীর কিছু খাবার জোটেনি। ঐ দুধটুকু পলকেই সাবাড়। আজকের দিনটাতো কেটে গেল। কাল কি হবে?

- কাইল ইস্কুল যাওনের পর আব্বু যদি তোরে বনে ছাইড়্যা দিয়া আসে। তাইলে তো আমি ট্যারও পামু না। আর কদ্দিনই বা তোরে লুকায়ে রাখুম।

রুকমনি সিক্সের বি সেক্‌শেনে পড়ে। তেত্রিশ রোল নাম্বার। পড়াশোনা মোটেই ভালো লাগে না তার, ক্লাসে আসতে হয়, নইলে আব্বা যে মারে, তবুও বাগ্‌দীদের ছেলেপিলের সাথে কাদাজলে মাছ ধরতে চলে যায় কখনো কখনো। ঘাসের উপরে বসে থাকা ফড়িং ধরতে ধরতে পেরিয়ে যায় জোড়ামৌলির মাঠ। আর ভোরের বেলা, গাঁয়ের শিব মন্দিরের পিছনে থাকা শিউলি গাছটা থেকে আঁচল ভর্তি ফুল কুড়িয়ে এনে, খামারে শিবপুজো করে কখনো কখনো। সবথেকে এটাই বেশি ভালো লাগে ওর। অবশ্য এর জন্য মারও খেয়েছে সে আব্বার কাছ থেকে।

-- আর কোনোদিনও মন্দিরটার চাইর পাশে

ঘোরাঘুরি কর্‌বা না।

-- ক্যান আব্বু?

-- জানোস না, ওটা ওদের ঠাকুর, আমাদের না।

-- আমাদের না? ক্যান আব্বু?

-- যা কইসি তাই কর্‌বা। যাইবা না তো যাইবা না।

তবুও লুকিয়ে লুকিয়ে সে পুজো করতে ছাড়ে না। 'ওদের ঠাকুর' কখনো কি টুনটুনিকে ভালো রাখবে না? নাকি পরীক্ষায় বেশি নম্বর দেবে না? ওপাড়ার রমলিও তো মানত করেছিল, গবুর দিও সেদিন পুজো করেছিল। সব আশির্বাদ আর সব নম্বর ওদেরকেই কি দিয়ে দেবে? না না, কিছু তো অবশিষ্ট থাকবেই। ওটা ছাড়া চলবে না। ওটাকে হাত করতেই হবে।

টপটপ করে জল পড়তে লাগল রুকমনির গায়ে। ঘুমটা ভেঙে গেল। দেখলো টুনটুনিও ভিজে গেছে। চারদিকেই জল পড়ছে। দাঁড়ানোর কোথাও জায়গা নেই। আব্বা, আম্মা, আপা-সকলেই থালা আর বাটি হাতে একোণ-ওকোণ করছে।

-আল্লাগো রাইতটা পার কইর‍্যা দাও। ছেলে পিলে লইয়া এখন কই যামু।

রুকমনিও জড়োসড়ো হয়ে টুনটুনিকে কোলে নিয়ে আল্লা আর 'ওদের ঠাকুর'কে ডাকতে লাগল। কি জানি হয়তো এখনো তারা কেউ ঘুমায়নি। যদি দুজনের একজনও রুকমনির প্রার্থনা শোনে!

ঈদের মাস দুয়েক পরে দুর্গাপুজো। এসময় নতুন নতুন জামা পরে ওদের ছেলে-মেয়েরা ঠাকুর দেখতে বেরোয়। এবছর ঈদের রুকমনির নতুন জামা হয়নি। রুকমনির খুব ইচ্ছা ঐ লাল পেড়ে শাড়ি পরে জল ও আমপল্লব ভরা ঘট কাঁখে নিয়ে কলাবউ-এর সাথে সাথে হেটে গিয়ে দীঘিতে ডুব দিয়ে আসতে। কিন্তু তা হবার নয়। একে তো আব্বার মার, অন্যদিকে...। পুজোর কদিন তো মন্দিরের কাছেই ঘেঁষতে পারে না। বামুনদের গিন্নিগুলো আর বুড়ো লোকগুলো দুর দুর করে তাড়িয়ে দেয়। এক পাশেও ঠাঁই হয় না। ভিতরে কি হয় জানতে ইচ্ছে হয় তার। বিজয়ার দিন, মহরমে পাওয়া তিনবছর আগেকার ভালো জামাটা গায়ে দিয়ে, আব্বাকে আর 'ওদের'কে লুকিয়ে মণ্ডপে ঢুকেছিল সে। হাত দিয়ে প্রতিটি ঠাকুরকেই ছুঁয়েছিল। মায়ের পায়ের সিঁদুর নিয়ে কপালে তিলকও কেটেছিল। ঘরে এসেই তাড়াতাড়ি সাবান দিয়ে মুছে ফেলেছিল। তবে, বেলপাতাগুলো টুনটুনির মাথায় ঠেকিয়ে বই-এর মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

কাল যখন ওর আব্বু টুনটুনিকে বনে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল তখন ও স্কুলে। এবছর ফেল করে যখন নতুন ক্লাসে উঠতে পারেনি তখন এমন কষ্ট হয়নি। আগের বচ্ছর ছাগলটাকে যখন বিক্রি করে দিয়েছিল, তেমনি রকম কষ্ট। আজ স্কুল না গিয়ে রাখাগুলোর পিছনে পিছনে মড়াখুলের বনটা পর্যন্ত গিয়েছিল। বারবার নাম ধরে ডাকছিল প্রতিধ্বনি ফিরে এল, টুনটুনি না, খানিকক্ষণ শ্যাওড়া গাছের নিচে বসে হাউমাউ করে কাঁদলে সে। আর বসে বসে আল্লা আর 'ওদের ঠাকুর'-দুজনকেই ডাকতে লাগল। যদি দুজনের কোনো একজন টুনটুনিকে এনে দেয় তার কাছে। তবে সে দুজনকেই পাটিসাপটা খাওয়াবে। রোজাও রাখবে পরের বার। লুকিয়ে লুকিয়ে শিবের মাথায় জলও ঢালবে সে। কি জানি কে ওর ডাক শুনবে? -- আল্লা না 'ওদের ঠাকুর'? দুজনেই তো ঘুমিয়ে আছেন? জাগবে কিনা কে জানে!!

শিক্ষা আগে না অর্থ আগে?

— বিশ্বনাথ চন্দ্র
(বি. এ. ভূগোল সাম্মানিক প্রথম বর্ষ)

শিক্ষা আগে না অর্থ আগে? আমার মনে হয় এই প্রশ্ন কাউকে করা বৃথা। এই প্রশ্নের কারনে মানুষেরাও হয়তো রাজনৈতিক দলের মতো কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে যাবে। একদল মানুষ যারা বুদ্ধিমান তারা তো বলবেই শিক্ষা আগে। আর একদল মানুষ যারা বুদ্ধির অহংকার করেন তারাও বলবেন শিক্ষা আগে। আর একদল চুপ থাকবেন কারন এরা অশিক্ষিত। কিন্তু কেন শিক্ষা আগে? এই প্রশ্নের উত্তর হয়তো মুষ্টিমেয় কজন দিতে পারবেন। নিজের কাছে এই প্রশ্ন এলে আমি তো বলব 'অর্থ আগে। কারন টাকা না থাকলে তো আর শিক্ষা লাভ করা যায় না। বর্তমানে যেখানে সর্বশিক্ষা মিশনে বলা হচ্ছে 'শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার'। সেখানে কী আমরা শিক্ষাকে অনুগত অধিকার করে তুলতে পেরেছি। এতে আরো বলা হচ্ছে কোনো মানুষকে নিরক্ষর রাখা চলবে না। কিন্তু সর্বশিক্ষা মিশন চালু হওয়ার পরও কেন এত মানুষ নিরক্ষর? কী এই প্রশ্নের উত্তর? পিতা, মাতা ও অভিভাবকদের কর্তব্য ৬-১৪ বছরের শিশুদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটা তাদের সাংবিধানিক মৌলিক কর্তব্য। কিন্তু নিরক্ষর বাবা মা কে এসব বোঝানো মানে সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়। তারা ভাবেন যে, ছেলেকে স্কুলে পাঠিয়ে কী হবে তার থেকে ছেলে রোজগার করুক এতে বাড়ির আয় কিছুটা বাড়বে। এটা ভেবে অবাক লাগে আজকের দিনেও মানুষের চিন্তাভাবনা কেন এইরকম। এর উত্তরও একই 'অর্থ'। আজও আমরা দেখি বাসষ্ট্যাণ্ড, রেলষ্টেশন, রাস্তার পাশে শিশু ভিখারী দের ভিড়। এদের মধ্যে এখনো কেউ ভালো করে চলতে পর্যন্ত শেখেনি তারাও করছে ভীক্ষা। যদি শিক্ষায় আগে হতো তবে কী দোষ করেছে এই ছেলেগুলো। না গরিব হয়ে জন্মানো পাপ আমাদের সরকার কালও এদের দেখেনি, আজও দেখেনা আর ভবিষ্যতে কী হবে সেকথা বলা যাবে না। এখনো আমরা কলকারখানা না, মাঠে ও নানা জায়গায় দেখতে পায় শিশু শ্রমিক। মা আমাদের রাজ্যে ক্যানসার এর ন্যায় ব্যাধি স্বরূপ। যার চিকিৎসা করা যায় জীবনে অনেক উন্নতি করতে পারতো। কিন্তু সবার চোখের আড়ালে ধীরে ধীরে তারা চলে যায় অবনতির এরকম এক অন্ধকারে যেখানে থেকে তারা আর ফিরে আসতে পারে না। তাহলে কী লেখাপড়া করার অধিকার এদের কাছ থেকে কেউ কেড়ে নিয়েছে। কেন তারা ইচ্ছা থাকলেও স্বাধীন ভাবে বাঁচতে পারে না। পড়াশোনা তো দূরে থাক। যে শিশুদের দেশের উন্নতিকরার কথা তারাই বড়ো হয়ে করে দেশের ক্ষতি। যদি শিক্ষা আগে হতো তাহলে এই ছেলেগুলোও তো লেখাপড়া শিখে জীবনে উন্নতি করতে পারতো। কিন্তু তা হয় না। এর কারনও অর্থ। স্কুল, কলেজ সব জায়গায় এখন শুধু টাকা। আগে টাকা দাও তার পরে শিক্ষা। এরপর আসা যাক চাকরির কথায়। বেসরকারি চাকরির কথা থাক। আমাদের সরকার কাউকে চাকরি দেওয়ার আগে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা দেখেনে না দেখেন টাকা। যে যত বেশী টাকা দিতে পারবে সে তত আগে চাকরি পাবে। সে ছেলে যদি কিছু নাও যানে তাতে কোন অসুবিধা নেয়। এইসব দেখে মনে হয় আমাদের দেশে যার যত বেশী

টাকা আছে সে তত বেশী শিক্ষিত। এজন্য অনেক গরিব মেধাবী ছেলে বেকারত্বের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বেছে নেয় আত্মহত্যার মতো ভয়ানক পথকে। সরকারের বড়ো নেতারা বলছেন, পয়সা দিয়ে আর সরকারি চাকুরি করা যাবে না। কিন্তু তারা জানেন না আগের থেকে ওনারা যাদেরকে টাকা নিয়ে নিয়োগ করেছেন তারা ঠাকুর মন্দিরে টাঙিয়ে রাখা প্রনামী বক্সের মতো। যাতে যত পয়সাই ঢোকাও সে বাক্স ভর্তি হওয়ার নয়। অনেক সময় ভাবলে অবাক লাগে যে, এমনই বাঙলা কী চেয়েছিলেন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ। "Government of the people, by the people, for the people" কিন্তু সরকারের এইসব কার্যকলাপ দেখে মনে হচ্ছে "Government of the rich people, by the rich people, for the rich people" যে শিক্ষার দিকে সরকার তার সবথেকে বেশী নজর দেওয়া উচিত সেই শিক্ষাকে নিয়ে তারা খেলা করছেন। আজ এই পরিবর্তন কাল সেই পরিবর্তন। কিন্তু তারা বুঝতে পারছেন না তারজন্য বেশী ক্ষতি হচ্ছে শিশুদের।

তাই সরকার সহ সকল মানুষের কাছে আমার একটা কথায় বলা আছে-"এই অবস্থা এখন থেকে রোধ করার চেষ্টা করুন। তা না হলে আমাদের দেশ, আমাদের রাজ্য অবনতির, অশিক্ষার এমন এক অন্ধকারে চলে যাবে যেখান থেকে দেশকে বার করে আনা শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব হয়ে পড়বে।

"ইচ্ছা শক্তির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করিয়া ফলপ্রসূ করিবার শক্তি অর্জন করাই প্রকৃত শিক্ষা।"

-স্বামী বিবেকানন্দ

একরাশি বেদনার স্মৃতি

— কাকলী মিস্ত্রি
বি. এ. প্রথম বর্ষ, সংস্কৃত (অনার্স)

স্মৃতি কখনো সুখের হয় বা কখনো কষ্টের, বেদনার। তবে আমরা যেমনই স্মৃতি হোক না কেন ভাবতে ভালোবাসি। মনে হয় স্মৃতি নাড়াচেড়া করায় অনেক কিছুই ক্ষনিকের জন্য হলেও আমাদের কাছে এসে হাজির হয়। আমার জীবনের এই স্মৃতিগুলো আমাকে সারা সময় নাড়া দিয়ে যায়। এখনো তো বেশি পুরানো নয় ঘটনাগুলি। মানুষ পারলে অন্যকে ভুলে যেতে চায়, কিন্তু সত্যি করে কাউকে ভালোবাসলে তাকে কি করে ভুলে যায় কেউ? আমি স্বপ্না রাণী মুখার্জী আমার জীবনের সঙ্গে আমার এক প্রিয় বন্ধুরও জীবনের কষ্টের খুব মিল। তাই কষ্টটাও ছিল অনেক কাছাকাছি। ওর নাম রাজ বাড়ী। আমার এখন বয়স ছিল ১৩-১৪ বছর, আমার দাদার বয়স ছিল ২৪ বছর। ওর নাম ছিল রামদেব ভট্টাচার্য। সবাই ডাকতো দেব বলে। আজ থেকে ৭ বছর আগেও যে সুস্থ স্বাভাবিক ছেলেটি আমাদের সবার মধ্যে ছিল। তাকে এখন আর আমরা আমাদের মধ্যে পাই না। দাদার মনটা ছিল খুবই ভালো, শান্ত, নরম। ওর কাজই ছিল সবাইকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা আপন করে নেওয়া। ও সবাইকে খুব ভালোবাসত। ও ছিল সফল দায়িত্ববান সামরিক অফিসার। ও এই ২৪ বছর বয়েসেই প্রায় চরম উন্নতির শীর্ষে উঠেছিল। ও ছিল একজন সম্মানীয়। তবে সফল হতে গিয়ে ওকে অনেক কষ্ট করতে হত। ও প্রায়ই ফোন করে বলতো ওর ওখানে খুব কাজের চাপ, খুব কষ্ট। বাড়িতে আসত খুব কম। দাদার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল, ও ছুটি নিয়ে মেয়ে দেখার জন্য এল। ঠিক যেদিন মেয়ের বাড়িতে দেখতে যাওয়ার কথা তার আগের দিনেই ছিল আমার দাদার জীবনের শেষদিন। আমার মাসতুতো দাদা আমার দাদার থেকে ট্রীট চেয়েছিল চাকরীর জন্য। তাই দাদারা মিলে বেড়িয়েছিল বাইক নিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া দাওয়া করে রাত্রি ৯-৩০ থেকে ৯-৪৫ মিনিট নাগাদ বাড়ি ফিরছিল বাইকে করে। হঠাৎই একটা সময় বাইকটা দাদা আর কণ্ট্রোল করতে পারল না। একটা বাঁকের মুখে বাইকটা অ্যাক্সিডেণ্ট করল একটা পাথরের দেওয়ালে আর ওখান থেকে ধাক্কা খেয়ে একটা খাদে পড়ে গেল। গ্রামের মানুষ বেশি বেশি রাত্রি জাগে না কিন্তু খুব ভোরে ওঠে। তাই সারারাত দাদারা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করেছে। ভোরের দিকে কয়েকজন চিনতে পেরে বাড়িতে খবর দিলে পরে গাড়িতে করে হসপিটাল নিয়ে যাওয়ার সময় কিছুক্ষনের মধ্যেই আমার দাদার মৃত্যু হয়। আর একজন দাদা মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করে কোনো রকমে বাঁচিয়ে রেখেছে আজও নিজেকে। পরে জানা যায় সেও একটা যেন নতুন জীবন পেয়েছে, প্লাস্টিক সার্জারী, চোয়াল অপারেশন, মাথার স্ক্যান, হার্ট অপারেশন সবই চিকিৎসার পর। পরে জানা যায় বাইকটির নাকি ব্রেক কেউ কেটে দিয়েছিল। আজও ২৫ সে ডিসেম্বর দিনটা সবার কাছেই বড়দিন আর আমার কাছে বৃহত্তম বেদনাদায়ক দিন। ভাইফোঁটা, রাখি পূর্ণিমার দিনগুলো এখনো আশাতে কাটায়, যে কোনোদিন হয়তো এসে বলবে আমার হাতে রাখি পরিয়েছে বোনটি। আজও খোলা আকাশের ছাদে একলা রাত্রিতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি তারার মাঝে ইচ্ছে করে আমার প্রিয় দাদাকে খুঁজতে।

অন্যদিকে ছিল আমার বন্ধু রাজের বেদনা দায়ক বিজড়িত কিছু স্মৃতি, কিছু মুহূর্তের কথা। ওরা ছিল তিন ভাইবোন, অর্থাৎ দুইবোন আর এক ভাই। ওদের নাম ছিল রাজ, শিল্পা ও ঝুমা। ওদের তিনজনের সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। শিল্পা আর রাজ থাকত নিজের বাড়িতে ওদের মা ও বাবার সাথে। আর রাজের মামাবাড়িটা ছিল ওর বাড়ির খুব কাছাকাছি। ওখানে থাকত ঝুমা। মেয়েটি ছিল খুব ভালো, শান্ত, সুন্দর। কিন্তু আমরা মনেহয় সবাই জানি যে যারা ভালো মনের মানুষ হয় তাদের ভগবান খুবই কম সময় দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠায়। তাই হয়েছে এই সুন্দর নিস্পাপ মেয়েটির উপর। আমরা জানি দূরে থাকলে একে অন্যের প্রতি ভালোবাসাটা গভীর হয়। তাই যতটা রাজ শিল্পাকে ভালোবাসত, তার থেকে অনেক বেশি ঝুমা রাজকে বা রাজ ঝুমাকে ভালোবাসত। ও ওর দাদাকে পেলে যেন পৃথিবীতে সবথেকে খুশি হত। ওর দাদার উপস্থিতিতে যেমন ও খুবই খুশি হত আবার ঠিক তেমনই ওর দাদার হঠাৎ করে ওর সাথে বেশিক্ষণ না থেকে চলে আসতে চাইলে ও কান্নায় ফেটে পড়ত। এইভাবে দুই ভাইবোন মিলে মিশে একসাথে থাকলে দেখে মনে হত যেন পৃথিবীর সব হাসি খুসি মনের মধ্যে জমানো ছিল ওদের। তখন ঝুমার বয়স ১২-১৩ বছর আর রাজের বয়স ১৫-১৬ বছর। হঠাৎই একদিন রাত্রিতে ঝুমার অসহ্য পেটে ব্যথা শুরু হল। রাতের অন্ধকারেই মেয়েটিকে হসপিটালে ভর্ত্তি করেছিল ওর বাড়ির লোক। ছোট্ট রাজকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে ওর মা বাবা ওর বোনের কাছে যান। সকালে ও ওর বোনের ব্যাপারে সবটা জানতে পেরে খুবই কষ্ট পেতে থাকে। আধুনিক দিনগুলোর মতো আগেকার দিনগুলি ছিল না। কোথায় ভর্ত্তি করেছে, কীভাবে যেতে হয় রাজ এইসব কিছুই জানত না। ও সবাইকে অনেক অনুরোধ করেছিল। কিন্তু সেদিন কেউ এই ছোট্ট রাজের কথা রাখেনি। ওদিকে ওর প্রাণের প্রিয় বোন হসপিটালে অসহ্য ব্যথা সহ্য করেও একমনে ওর দাদাকে ডেকে চলেছে। আর এদিকে রাজ ওর বোনের কাছে না যেতে পেরে কষ্ট পাচ্ছে। আসতে আসতে মেয়েটির সুন্দর ফুটফুটে জীবন যখন প্রায় শেষের দিকে তখনও ও ওর মাকে বলেছিল 'মা দাদাকে আমাকে দেখতে এল না' তারই কিছুক্ষন পর এই সুন্দর ফুটফুটে নিস্পাপ মেয়েটি তার পরিবারকে কাঁদিয়ে সবার থেকে ছুটি নিয়ে নেয় চিরকালের জন্য। পরে রাজ ওর মার থেকে ঝুমার মৃত্যুর আগে যে বলা কথাটা শুনে আজও নিজেকে খুব অপরাধী বলে ভাবে। ও আমার মতো ভাইফোঁটা, রাখিপূর্ণিমাতে আমার মতোই মিস্ করে ওর বোনকে। ও আমার মতো আশাতে থাকে হয়তো রাখিপূর্ণিমাতে শিল্পার পরে এসে মিষ্টি হেসে ঝুমার হাতে রাখী বেঁধে দেবে। আজও আমাদের দুজনেরই একসাথে বলতে ইচ্ছে করে তোমদের আবির্ভাব হয়েছিল এক মেঘলা ঝলমলে সূর্যের মতো। কিন্তু সে সূর্যের উজ্জ্বলতা খুবই ক্ষণিকের।

"অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এক টুকরো ভুল

—রিমা দেয়াশী
(বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ)

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে তৈরী হয়ে জুতোগুলো পরতে পরতে রুবি তার মাকে বলল-- মা আমি আসছি। মা জিজ্ঞাসা করল কোথায় যাচ্ছিস, কিছু তো খেয়ে যা। রুবি উত্তরে বলল-না মা আজ আর খাবার সময় নেই। আর তুমি তো বেশ ভুলে যাও। সেদিন তোমায় বললো না সামনের ১১ তারিখে পলাশ লণ্ডন থেকে ফিরছে। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে। আসি না-একথা বলতে বলতে রুবি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

রুবির মা দেখল মেয়ে ঝড়ের মতো বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। তখন তার মা দরজাটা লাগিয়ে চিন্তা করতে লাগলো পলাশের কথা-পলাশ, রুবির বাবা অরুন মুখার্জীর বন্ধু সুকোমল গাঙ্গুলির একমাত্র ছেলে। সেই ছোট্ট বেলায় রুবি তখন সাতমাসের তখন ওর অন্নপ্রাশনে এসে মেয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে পলাশের বউ করার প্রতিশ্রুতি সুকোমল বাবু তার গিন্নী সাধনার অনুরোধে রুবির বাবাকে দিয়েছিলেন। তাই বলে তিনি খুশি ছিলেন না তা নয়, তিনিও বন্ধুকে ভবিষ্যতে আত্মীয়ের সূত্রে বন্ধনের কথা ভেবে কম খুশি হননি। তার পর রুবি আর পলাশ যে কোনো অনুষ্ঠানে একসাথে হলেই কত খেলা করেছে, দুষ্টুমি করেছে আবার ঝগড়াও করেছে। এক স্কুলে দুজনে পড়াশুনাও করেছে। রুবি ভালোবাসত ভূগোল আর পলাশ বিজ্ঞান। উচ্চমাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করে পলাশ যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে লণ্ডনে চলে গেল, তখন রুবি একাই এখানে ভূগোল নিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু পলাশের অনুপস্থিতিতে রুবি একা একা কত কষ্ট পেয়েছে তা ওর মায়ের চোখ এড়ায়নি। আজ পলাশ আসছে আর তাই রুবির জীবনে দারুন খুশির দিন এটা।

কিছুক্ষন পর রুবি পলাশের বাড়ি গিয়ে পলাশের মাকে জিজ্ঞাসা করল কাকিমা পলাশ কি এসেছে? পলাশের মা বলল হ্যাঁ পলাশ তো এই ফিরলো ও বলছিল তুমি ওকে আনতে যাবে। তাই আমরা কেউ গেলাম না, আবার ওর সাথে তুমিও এলে না। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় বলল-জানি না। রুবি বলল আর বলবেন না কাকিমা-আমি একটা কাজে আটকে পড়েছিলাম। যখন এয়ারপোর্টে পৌঁছালাম সেখানে ওকে দেখতে না পেয়ে বাড়িতে চলে এলাম আর ফোন টাও তুলছিল না ও। ও...এই জন্যই ও রেগে আছে, পলাশের মা বলল। তুমি যাও ওর সাথে দেখা করে এসো, আমি চা নিয়ে যাচ্ছি।

রুবি ভয়ে ভয়ে পলাশের রুমে ঢুকে দেখল পলাশ পিছন ফিরে বসে আছে। রুবির ডাকতে পলাশ সাড়া দিল না। রুবি বোঝানোর চেষ্টা করল কিন্তু পলাশ না শুনে বলল তুমি যাবে না যাবে না সেটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি শুনতে চাই না। রুবির একটু মিষ্টি কথায় পলাশ গলে গেল, হেসে বলল তুমি যে বড় হয়েছে তা তোমার পাকা পাকা কথা শুনেই বোঝা যাচ্ছে। পলাশের বাবা এসে রুবির সাথে কথা বলল এবং বলল একদিন তোমাদের বাড়ি যাব কারণ বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে, পলাশকে তো আবার চাকরিতে জয়েন্ট

করতে হবে। পলাশের বাবা রুবিকে পড়াশোনার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করাতে রুবি বলল সামনের মাসে কলেজের নিয়মনুযায়ী একবার এক্সকারসনে যেতে হবে।

বাড়ি ফিরে আনন্দে রুবির সারারাত ঘুম হল না। এইভাবে একসাথে তাদের বেশ কিছু দিন কেটে গেল, কিন্তু পলাশ জানতেও পারলো না রুবি ওকে কতটা ভালোবাসে। ২৭ তারিখে রুবিকে বিশাখাপত্তনামে যেতে হবে তাই আগের দিন আশীর্বাদ হবে ঠিক হল। যথাসময়ে আশীর্বাদ হল পরের মাসে বিয়ে হবে কথা রইলো। সবাই চলে যাবার পর পলাশ রুবিকে খঁজতে খঁজতে ছাদে গিয়ে রুবিকে হাতে হাতটা রাখতেই রুবি জোরে হাতটা সরিয়ে নিয়ে বলল--আমি তোমায় কিছু বলতে চাই কিন্তু বলতে পারছি না বলে এই চিঠিটা লিখে এনেছি তুমি কথা দাও আমি টুরে যাওয়ার পর তুমি এটা পড়বে। যথারীতি রুবির কথা মতো পলাশ চিঠি খুলে দেখল তাতে লেখা আছে--

"পলাশ, আমি কিছুদিন যাবৎ একজনকে খুব ভালোবেসে ফেলেছি কিন্তু তাকে বলতে পারছি না, জানি সে আমাকে খুব ভালোবাসে। প্লিজ তুমি একটু তাকে বলে দেবে, তার নামটা পরের পাতায় লেখা আছে--প্লিজ বলে দিও।"

নামটা না পরেই পলাশ চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলল, আর মনে মনে ভাবল তাহলে কি আমাকে এয়ার পোর্টে না আনতে যাওয়ার এটাই কারণ ছিল? বেশ রুবি আমাকে এসব আগে বলল না। কেন ও আমার সাথে এরকম করল?

সাতদিন পর রুবি বাড়ি ফেরার পথে পলাশদের বাড়ি গেল চাবি দেওয়া দেখে বাড়ি গিয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল পলাশের ফোনটা অফ্ কেন? ওরা কোথায়? রুবির মা বলল সে তো চলে গেছে, কেন এমন ন্যাকামি করছিস, তুই তো বলেছিস্ তুই নাকি অন্যকাউকে ভালোবাসিস। পলাশের বাবা তো বাড়ি এসে তাই বলে গেলেন, এমনকি তিন দিনের মধ্যে পলাশের বিয়ে দিয়ে ওরা সপরিবারে লণ্ডনে চলে গেছেন। ছিঃ তোর জন্যে আমাদের মাথা আজ হেঁট হয়ে গেল। একথা শুনে রুবি আর কোনো কথা বলতে পারল না। রুবির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সে বুঝতে পারল না কেন এমন হলো। তার ভালোবাসার মানুষ যে পলাশই একথা সেতো চিঠির পরের পাতায় লিখেছে। সেটা কি পলাশ পড়েনি। পলাশের মিষ্টি হাসি দেখতে গিয়ে রুরি তাকে হারিয়ে ফেলল। নিজের অজান্তে একটু মজা করতে গিয়ে সে নিজের এতো বড় সর্বনাশ করে ফেললো। শুধুমাত্র মুখে তার মনের কথা বলতে না পারার জন্য তার নিজের এতো বড়ো ক্ষতি করে ফেলল। তার চোখ ফেটে জল এলো, অকুল সমুদ্রে হারিয়ে যেন সে কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চাইলো, আর তার কানের কাছে তার মেয়ের বলা কথাটা বাজতে লাগল--

"সে তো চলে গেছে।"

নস্যির নেশায় ....

—আবদুল্লা হক মির্দ্যা (বাবু)
(বাংলা সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

লোকটাকে আসতে দেখে নির্মলবাবু ভাবলেন তাহলে একেই না হয় জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাক।

কিছু বলবেন? নির্মলবাবুকে বোকা বোকা মুখে তাকিয়ে থাকতে দেখে লোকটা প্রশ্ন করল।

-- হ্যাঁ মানে ... নির্মলবাবু বললেন, এই পাড়ায় নতুন তো।

-- আসিনি কখনো আগে, তাই এই ঠিকানায়.. মানে এই

-- ঠিকানাটা, এই বলে নির্মলবাবু পকেট থেকে একটা কাগজের চুকরো বার করতেই লোকটা সেটা ছিনিয়ে নিয়ে, চোখ বুলিয়ে বলল, বুঝেছি। বেকবাগান এম.বসু রোড তো? সে আরো অনেক এগিয়ে। এখানে কোথায় খুঁজছেন। আসুন আমার সঙ্গে দেখিয়ে দেবো আমাবর যাবার পথেই পড়বে কিনা তাই।

নির্মলবাবু মনে মনে বললেন বাঁচলাম বলতে না বলতেই লোকটা তার মুখের দিকে তাকালেন। নির্মলবাবু থতমত খেয়ে বললেন, না না অন্য কিছু না, বলছিলাম অনেক রাত হয়ে গেছে। আর তাছাড়া পথেও কেউ কোথাও নেই। ভেবে পাচ্ছিলাম না এতটা -- অন্ধকার পথ পেরিয়ে কি করে পৌঁছাব। আপনাকে দেখতে পেয়ে আমার দারুণ সুবিধা হলো। এই বলে দু'জনে পা মিলিয়ে হাঁটতে শুরু করল। নির্মলবাবু বললেন এখান থেকে কত দূর আমার এই ঠিকানাটা? তা প্রায় আধকিলোমিটার তো হবেই লোকটা উত্তর দিল। আপনি যাচ্ছেন কোথায়? লোকটা জানতে চাইল।

আজ্ঞে, ভাইঝির শ্বশুরবাড়ি। আসছি মেমারী থেকে। মেমারী! মানে বর্ধমান?

আজ্ঞে, নির্মলবাবু একটু থেমে বললেন, ঠিকা মেমারী নয়, আমার বাড়ি আরো একটু ভেতরের দিকে। মেমারী ষ্টেশন থেকে তা প্রায় ২০-২৫ কিলোমিটার পথ। এখানে ত্রিভলী জজকোর্টে আমার একটা কেসের শুনানি পড়েছে। সকাল দশটায় হাজিরা দিতে হবে। তাই ভাবলাম ভাইঝির বাড়ি গিয়ে আগের রাতটা থাকি। কে জানে, যদি দেরি হয়ে যায়? অতদূর থেকে আসা, সকালের ট্রেনটা যদি ফস্কে যায়।

ভালই করেছেন। লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল, এ পাড়ায় রাস্তাঘাট সব আমার মুখস্থ। কথাটা বলেই, লোকটা বাঁয়ে ঘুরল। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলবাবুও সঙ্গ নিলেন কিন্তু বাঁদিকে ঘুরে সেই লোকটাকে আর দেখা গেল না যেন কোথাও উধাও হয়ে গেছে। অবার পরমুহূর্তে এসে বলতে লাগল, এবার ফের বাঁ হাতে গিয়ে, তারপর... আপনি কোথায় গিয়েছিলেন, এই আর কি বুঝলেন না নস্যি না হলে আর পারছি না, এই তারই খোঁজে ..... নির্মলবাবু বললেন ও ঠিক আছে ঠিক আছে ..... এরপর কোন দিকে যাব। হ্যাঁ তারপর দু'বার ডানদিকে বেঁকে যাওয়ার পর সোজা নাক বরাবর হাঁটতে হবে। তবে! আগে পৌঁছাব আমি, তারপর আপনি।

এতসব আঁকাবাঁকা রাস্তা, আপনি না থাকলে মুসকিলে পড়তাম। খানিকটা ঘুরপাক খেয়ে শেষে মন হয় ফিরেই যেতে হতো।

ঠিক। আপনি বেশ অপ্রিয় সত্যি কথা

বলেন .... লোকটা বলল, এ পাড়ার রাস্তাগুলো ঘুরপাকই বটে যেন গোলকধাঁধা। এখানে ঠিকানা খুঁজে পাওয়া বেশ ঝামেলার।

আপনিও কি আসছেন বাইরে থেকে? নির্মলবাবু প্রশ্ন করলেন। বাইরে ঠিক বলা যাবে না। এখানে আমি এই আশপাশেই থাকি। তবে তাকে কী আর ঠিক থাকা বলা যায় -- বলতে বলতে থমকে গিয়ে কথা ঘুরিয়ে সে বলল যাকগে, সে অনেক কথা। সেসব না হয় নাই বললাম।

আপনি কি তার মানে একটা রাত কাটিয়েই --

না না। লোকটা হাঁকপাঁক করে উঠে বলল, রাতফাত আমি কাটাবো না, জাস্ট যাব আর আসব।

বলেন কী? নির্মলবাবু হাঁটতে হাঁটতে বললেন, এই রাতে পৌঁছেই আবর ফিরে যাবেন? এতটা পথ। অবশ্য এর একটা উপায় আছে-- রিক্সা। কারণ ট্রাম, বাস তো বন্ধ হয়ে গেছে।

ওসবের আমি তোয়াক্কা করি না। লোকটা নির্মলবাবুকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ওসব ট্রাম, বাস, অটো, রিক্সায় আমার অরুচি, ওসব ঢের চড়েছি, এখন যেখানেই যাই হেঁটেই যাই।

বলেন কী বয়স তো দেখছি ভালই হয়েছে। এত বয়সেও আপনি --

হ্যাঁ। বয়স ভালই হয়েছে। বোধ হয় চুরাশি-পঁচাশি হবে। ওসব আর ঠিক হিসাব নেই। লোকটা কথা বলেই হাঁটার গতিটা একটু বাড়িয়ে দিল। পাও ফেলতে লাগল বেশ লম্বা লম্বা।

উফ্! নির্মলবাবু ওর সঙ্গে পা মিলিয়ে হাঁটতে গিয়ে দম ফুরিয়ে যেতে লাগল। তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, বাপরে আপনার সঙ্গে পা মিলিয়ে চলা তো দেখছি প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। একটু যদি আস্তে হাঁটেন।

আর আস্তে, আস্তে আর জোরে। নস্যি নস্যি করে প্রাণটা বলে এখন আইচাই করছে। এই দেখুন দেখা যাচ্ছে আমার বাড়ি--লোকটা নির্মলবাবুকে দেখালো দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে একটা গেটওয়ালা বাড়ি।

আপনি এই বাড়িতেই থাকেন? নির্মলবাবু বললেন, আপনার বুঝি নস্যির নেশা?

নেশা বলে নেশা! নস্যি ছাড়া আমি একদণ্ডও থাকতে পারি না। অথচ আজ একমাস হয়ে গেল --

সে কি! একমাস নস্যি নেননি? তবে আর শুনছেন কী! কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন বুঝি? বাইরে তো বটেই।

তা সেখানে কি নস্যি কিনতে পাওয়া যায় না? নস্যি যদি মিলতো সেখানে তাহলে কি আর আসতাম এমন ছুটতে ছুটতে! আজ আমার নস্যি চাই-ই চাই।

এখন তো প্রায় পৌঁছেয় গেছেন নির্মলবাবু বললেন। পরমুহূর্তেই কী যেন খেয়াল হলো তাঁর, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, আজই আবার ফিরে যাবেন? এটা যদি আপনার বাড়িই হবে তাহলে--

বাড়ি তো বটেই। তবে এখন আর এখানে আমি আর থাকছি কোথায়? নির্মলবাবু একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, মানুষটা আপনি ভালই। কিন্তু বড্ড হেঁয়ালি করেন।

যা বলেছেন। কথাটা বলেই লোকটা এবার সেই বাড়িটার গেটে দাঁড়িয়ে পড়ল। নির্মলবাবু বললেন, এটাই আপনার বাড়ি?

হ্যাঁ এটাই। দেখছেন না গেটে আমার নাম লেখা আছে। লোকটা নির্মলবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো গেটে ঝোলানো নেমপ্লেটের দিকে।

কিন্তু একি! নির্মলবাবু নামটা পড়েই চোখ দুটোকে কপালে তুললেন। একার নাম?

নেমপ্লেটে লেখা আছে নিতাইচন্দ্র মালাকার। আপনার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু কেন? নির্মলবাবু বড় বড় চোখ তুলে লোকটার দিকে তাকালেন।

এখন তো আমার নামের আগে একটা চন্দ্রবিন্দুই বসার কথা। মুখ টেপা হাসি ছড়িয়ে লোকটা বলল, আমার ছেলেরা ঠিক লিখেছে। যদিও ছেলেগুলো এক একটা গাধা!

সে কি আপনার ছেলেদের গাধা বলছেন কেন? নির্মলবাবু প্রশ্ন করলেন

বলব না। লোকটা রেগে উঠে বলল, অত খরচা করে বাপের শ্রাদ্ধ করলি, অত দানধ্যান করলি, আর তাতে একটা নস্যির ডিবে দিতে ভুলে গেলি! জানিস তো, তোদের বাপ নস্যি ছাড়া একটা মিনিটও থাকতে পারে না। আজ একমাস নস্যি না নিয়ে ..... উফ! শরীরের যে কী অবস্থা হয়েছে, সে আর কী বলব।

তার মানে --

আরে হ্যাঁ ওই নস্যির ডিবেটা নিতেই তো আজ আমার আসা, ডিবেটা নেব আর কেটে পড়ব। কথাটা বলেই লোকটা যে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

নির্মলবাবু একবার এদিকে-ওদিকে তাকিয়েই পাঁই পাঁই করে ছুটতে শুরু করলেন।

"ভগবান যে গুণ, যে প্রতিভা, যে বিদ্যা ও যে উচ্চ শিক্ষা দিয়াছেন, সবই ভগবানের। আমি যদি সবই নিজের জন্য, নিজের সুখ বিলাসের জন্য ব্যয় করি তাহা হইলে আমি চোর।"

-ঋষি অরবিন্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্মরণে

— অনিরুদ্ধ নায়ক
(বাংলা সাম্মানিক)

বাংলা সাহিত্যের আধুকিতম শেষ মানুষটির প্রয়ান ঘটল গত মহানবমী তিথিতে ২৩শে অক্টোবর, ২০১২ (বাংলা ০৬ই কার্ত্তিক, ১৪১৯ সন) ৭৮ বছর বয়সে। 'নীললোহিত' নামে পরিচিত এই সাহিত্যিকের মহাপ্রয়াণে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক গভীর শূনতার সৃষ্টি হল। সারা জীবন ধর্মে কুৎসা-নিন্দা, তর্ক-বিতর্ক থেকে যে মানুষটা শতযোজন দূরে থেকেছেন সেই খোলা-মেলা মানুষটির অভাব প্রতি মুহূর্তে অনুভব করছে এপার-ওপার বাংলার আপামর জনসাধারণ রবীন্দ্রোত্তর যুগের যে তিনজন কবির নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হয় তাহা হলেন বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়। এঁরা চেষ্টা করেছিএলন বাংলা সাহিত্যের পালে নতুন হাওয়া বইয়ে দিতে। যার অনেকাংশে সফল হয়েছিলেন তাঁরা। তৎকালীন কলেজের যুব সমাজের কাছে তাঁরা অধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তিনি নিজের নামের পাশাপাশি 'নীললোহিত', 'সনাতন পাঠক' এবং 'নীল উপাধ্যায়' ছদ্মনামে দু'শোরও বেশি বই লিখেছেন ভিন্ন ,স্বাদে, ভিন্ন আঙ্গিকে।

অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরের ময়েজ পাড়ায় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর (বাংলা ১৩৪১ সালের ২১শে ভাদ্র) সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। তাঁর শিক্ষা এবং কর্মজীবন উভয়ই অতিহাহিত হয় কোলকাতা শহরে। যে তিনটি কলেজে তিনি পড়াশোনা করেন সেই কলেজগুলি হল -- সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, দমদম মতিঝিল কলেজ এবং সিটি কলেজ। অবশেষে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় এম.এ. পাশ করেন। ইতিমধ্যে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'কৃত্তিবাস' নামে একটি পত্রিকা বের করেন, যা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। তারপর ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাতীদেবীকে বিয়ে করেন। সেই বছই জন্ম হয় তাঁদের একমাত্র ছেলে সৌভিকের।

তিনি নিজেই বলেছেন যে কবিতা তাঁর প্রথম প্রেম। তিনি যে কবি হিসাবে সফল এবং ব্যাপক জনপ্রিয় তার প্রমাণ মেলে তাঁর 'নিখিলেশ' এবং 'নীরা' সিরিজের কবিতাগুলির জনপ্রিয়তা দেখে। পরবর্তীকালে এই কবিতা সংকলনগুলি ইংরাজীতেও অনুদিত হয়। অবশ্য তাঁর প্রতিভা কাব্য ছাড়িয়ে গদ্য সাহিত্যেও বিরাজ করে। তার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' ('দেশ'পত্রিকা, ১৯৬৫)। এছাড়াও 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'নীললোহিতের চোখের সামনে', 'নীললোহিতের দেখা-না দেখা', 'শেষ দেখা হয়নি', 'যুবক-যুবতীরা', 'সরল সত্য', 'সংসারে একা সন্ন্যাসী', 'কালো রাস্তা সাদা বাড়ি', 'কবি ও নর্তকী', 'তুমি কে?', 'ছবির মানুষ', 'মনের মানুষ', 'নবজাতক', 'জল-জঙ্গলের কাব্য', 'স্বর্গের নীচে মানুষ' তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির

মধ্যে অন্যতম। বড়দের পাশাপাশি ছোটদের কাছেও তিনি সমান জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর সৃষ্টিকরা 'কাকাবাবু' চরিত্রটি নিয়ে লেখা ৩৫টি উপন্যাস ছোটোদের ব্যাপক জনপ্রিয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সেই সময়' সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার এনে দেয়। প্রকাশিত হওয়ার পর দু-দশকেরও বেশি সময় ধরে সেটি বেস্ট সেলার ছিল। তাঁর অন্যান্য বেস্ট সেলার উপন্যাস গুলি হল -- 'প্রথম আলো', 'একা এবং কয়েকজন', এবং দেশভাগের পটভূমিতে লেখা পূর্ব-পশ্চিম'। এছাড়াও তিনি 'বঙ্কিম পুরস্কার' (১৯৮২) এবং দুবার 'আনন্দ পুরস্কার' (১৯৭২, ১৯৮৯) পান। পাঁচ বছর সহ সভাপতি থাকার পর ২০০৮ খ্রীঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি নির্বাচিত হন।

তাঁর প্রথম উপন্যাস 'আত্মপ্রকাশ' সাহিত্য সমাজে প্রবল ঝড় তোলে। এই উপন্যাস সমালোচকদের প্রশংসা আদায় করলেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিতর্কের সৃষ্টি করে। এর ফলে তাঁকে বহুদিন কলকাতার বাইরে কাটাতে হয়, এমনকি সত্যজিৎ রায়ও এই উপন্যাসটিকে নিয়ে ছবি তৈরীর কথা ভাবলেও বিভিন্ন কারণে পিছিয়ে আসেন। তবে 'আত্মপ্রকাশ' নিয়ে ছবি না করলেও তাঁর 'প্রতিদ্বন্দ্বী', 'অরণ্যের দিবারাত্রি' উপন্যাস গুলিকে রূপালি পর্দায় হাজির করে তাঁকে ছাত্র সমাজের আরও কাছাকাছি এনে দেন সত্যজিৎ রায়। উপন্যাসের মতো ছবিগুলিও কালজয়ী হয়ে ওঠে। সম্প্রতি গৌতম ঘোষ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'মনের মানুষ' উপন্যাসটির চলচিত্রায়ন করেন এবং ছবিটি একাধিক জাতীয় পুরস্কার পায়। এছাড়াও গৌতম ঘোষের 'অন্তর্জলী যাত্রা'-র সংলাপ পরিমার্জনা করেন তিনি। 'দেখা' ছায়াছবিটির চিত্রনাট্যও তিনি যুগ্মভাবে গৌতম ঘোষের সঙ্গে লেখেন। এছাড়া 'পদ্মানদীর মাঝি' ছবিটির জন্য একটি গানও লেখেন তিন। তাঁর লেখা 'স্মৃতির শহর' কবিতাটি পরিচালক অপর্ণা সেন ২০১১ সালে তাঁর 'ইতি মৃণালিনী' ছবিতে গান হিসাবে ব্যবহার করেন।

অনেকেই বলেছেন যে, তিনি 'সারপ্রাইজ' দিতে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর মধ্যদিয়েও হয়ত তিনি সেই 'সারপ্রাইজ' দিয়ে গেলেন পাঠককুলকে। তবে তিনি রয়ে গেলেন তাঁর অমর সৃষ্টি গল্প, উপন্যাস, কাব্য, রম্যরচনার মধ্যদিয়ে। এই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব তাঁর মরনোত্তর দেহদান করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর পরিবারের আপত্তিতে তা সম্ভব হয়নি। তাঁর মৃত্যুতে সরকারী এবং বহু বেসরকারী উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় স্মরণ সভার আয়োজন করা হচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার সপ্তম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যপুস্তকের নতুন সিলেবাসে তাঁর 'মেঘচোর' কবিতাটিকে স্থান দিয়ে তাঁকে সম্মান জানিয়েছেন। এছাড়াও তাঁর পরিবার ও 'কৃত্তিবাস ফাউণ্ডেশন'এর পক্ষ থেকেও এক বিশাল স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখান বহু সাহিত্যিক তাঁদের স্মৃতিচারণার মাধ্যমে এই প্রবাদপ্রতীম ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করেন। অবশেষে একটি কথায় বলা যায় --

"নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
হৃদয় মাঝারে তোমায় দিয়েছি যে ঠাঁই।"

পরিবেশ প্রসঙ্গে একটি লেখা

— ডঃ শুভ্রকান্তি সিনহা
(অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ)

বাঁকুড়া জেলার অরণ্য ও বন্যপ্রাণী নিয়ে একটা লেখা লিখব বলে ভাবছিলাম। হঠাৎ একদিনের একটা ঘটনা মনে পড়ল।

সেদিন ছিল হাটবার। কুলপাতাড়ির হাটে মানুষের ঢল নেমেছে। শীতের দুপুরে জমজমাট হাটের একদিকে বরসাতের চটান। সেখানে শামিয়ানা গেড়েছে। সভা হবে। অনেকের সাথে দুরু মাণ্ডি এসেছে সভা শুনতে। বাপের কাঁধে চেপে দুরু মাণ্ডির ছোট ছেলে পুতুও এসেছে। একটু পরে সভা শুরু হল। আকাশ, জল, জঙ্গল এসব নিয়েই সবাই বলতে লাগলেন। শক্ত শক্ত আইন আর নানারকম পদ্ধতি বোঝালেন। নাচ হল। গানও হল। গানের কথাগুলো ছিল এরকম -- "গাছ লাগাবো.....বুকের রক্তে.....গাছ উঠবে বেড়ে।"

হঠাৎ পুতু তার বাবাকে প্রশ্ন করে বসল -- "বাপ, রক্তে গাছ লাগে?"

বাবা বলল -- "চুপ যা। মেলা বকিস না।"

পুতু বলল - "উয়ারা যে বললেক্!"

প্রকৃতিপ্রেমী বললেন -- 'গাছ লাগাও, আরো গাছ।'

জননেতা বললেন - 'আমাদের পারতেই হবে।'

আরো একধাপ এগিয়ে মন্ত্রী বললেন -- 'আমরা এর মোকাবিলা করবই।'

কিসের মোকাবিলা করার কথা সবাই বললেন তা পুতু জানে না। বোঝেও নি। কিন্তু কুলপাতাড়ির ছোট্ট পুতুর মতো আমরা বুঝেছি 'মোকাবিলা' শব্দটা বড্ড ভারী। বড্ড কঠিন।

যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে সেটা শুধু বাঁকুড়া জেলার নয়, রাজ্যের নয়, দেশের নয়। সমস্যাটা পৃথিবীর। রোগগ্রস্ত পৃথিবীর সমস্ত লক্ষণ আমাজের জেলার পরিবেশেও আজ ফুটে উঠেছে।

সুদূর অতীত থেকে প্রায় উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলা ছিল দুর্ভেদ্য গভীর জঙ্গলে ভরা। 'শালার্জুন মাকটানাং কণ্টকাথও ভূরিশঃ'। শাল-সেগুন-মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা অঞ্চলটির নাম তাই ছিল 'জঙ্গলমহল'। 'রাঢ়ীখণ্ড জঙ্গলং'। দিন বদলাবার সাথে সাথে নাম যেমন বদলেছে, অরণ্যের কলেবরও হয়েছে ক্ষীণ।

আমাদের দেশের মোট আয়তনের অন্তত ৩৩ শতাংশ বনভূমি হওয়া প্রয়োজন। বাঁকুড়া জেলার মোট আয়তন ৬৮৮১০ বর্গ কিমি। মোট বনভূমি প্রায় ১৩৩৭ বর্গ কিমি। অর্থাৎ জেলা বনভূমির পরিমাণ ১৯.৪ শতাংশ। আনুপাতিকভাবে বিচার করলে প্রয়োজনীয় যেটুকু দরকার তার থেকেও ১৩.৬ শতাংশ কম। ১৯০৮ সালে ও ম্যালি (I.S.S.O.' Malley) সর্বপ্রথম বাঁকুড়া জেলার বন্যপ্রাণ ও উদ্ভিদের তালিকা তৈরী করেন। ধীরে ধীরে পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে এবং মানষের অবৈজ্ঞানিক ব্যবহার ও অসহযোগিতার ফলে জঙ্গলের সাথে সাথে বন্যপ্রাণীরাও আজ বিপন্ন। ১৮৬৩ সালে কর্ণেল গ্যাসট্রেলের বিবরণ অনুযায়ী বাঁকুড়ার জঙ্গলে এবং চারপাশে যত সংখ্যক প্রাণী প্রাজাতির দেখা

মিলত, আজ তার অর্ধেকও দেখা যায় না।

পরিবেশ সচেতনতা এখন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং গ্রাম গঞ্জের প্রত্যন্ত স্কুল থেকে শহরে শহরে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি, সেমিনার, স্লোগান আর মাতামাতি। কিন্তু কাঙ্খিত ফল কতটুকু মিলল তা বোধহয় আমাদের অজানা। আমরা পরিবেশ বিজ্ঞান পড়ি ও পড়াই। গ্রীণ হাউস এফেক্ট জানি। এল নিনো বুঝি। পরিবেশ দূষণের প্রতিকার নিয়ে তর্কে মাতি। কিন্তু সবুজ পৃথিবীকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে যে সভ্যতা, তার রাশ টেনে ধরা তো দূরের কথা, থামাবার ইচ্ছেও বোধহয় অমাদের হয় না।

গত দশ বছরে বাঁকুড়া জেলায় সবুজায়ন হয়েছে বেশ। অমাদের এই জেলা অন্যান্য সব জেলা অপেক্ষা পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে। আমরা নাকি অনেক বেশি পরিবেশ সচেতন হয়েছি। ইউক্যালিপটাস আর আকাশমণিতে ছেয়ে ফেলেছি ফাঁকা জমি। ইকোলজিক্যাল পার্ক বানিয়েছি বেশ কয়েকটা। গ্রামে গ্রামে বায়োডাইভার্সিটি ম্যানেজমেণ্ট কমিটি গড়েছি ইত্যাদি।

এসব আমাদের ভুল প্রয়াস। সংরক্ষণ এবং প্রাণীদের বিলুপ্তি রোধে এসবের ভুমিকা কতটুকু তা জানা নেই। শুধুমাত্র যে বোধটুকু পরিবেশ বাঁচাতে পারে - মানুষের মধ্যে তার অস্তিত্ব কই?

আমাদের শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া জরাজীর্ণ গন্ধেশ্বরী এখন ধুঁকছে। গত কয়েক বছরে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে উদবিড়াল আর গন্ধগোকুলের দল শুধুমাত্র কীটনাশকের ছেলেমানুষী ব্যবহারের ফলে। হাতির দল বার বার ফিরে আসছে সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, গঙ্গাজলঘাটির কাছাকাছি। শুশুনিয়া, শালতোড়ায় এখনও দলবেঁধে সজারু শিকার করে ভুরিভোজ করে পড়াশোনা জানা মানুষেরা। জয়পুর, বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে চুপিসাড়ে বিক্রি হয় হরিণের মাংস, চামড়া। আজও আমরা বুঝিনি যে সাপ মারলে পরিবেশের ক্ষতি হয়।

এসব চিত্র ক্ষয়িষ্ণু পরিবেশের। এবং সত্যটা হল এই যে, আমরা আজও আমাদের প্রকৃতিকে ভালোবাসতে পারিনি।

পরিবেশ বাঁচলে মানুষ বাঁচবে। মানুষ বাঁচলে সভ্যতা। আমার গ্রাম আমার দেশ, আমার প্রকৃতি -- আমি তার। এই বোধটুকু যেদিন মানুষের মধ্যে আসবে, সেদিন কোন সভা হবে না, মিছিল হবে না। বাপের কাঁধে চেপে হাটে বেড়াতে এসে গাছ লাগানোর কথা শুনে অবাক হবে না দুরু মাণ্ডির ছেলেরা।

হয়তো একঝাঁক নীলকণ্ঠ ইলেকট্রিকের তারে বসে একসাথে চিৎকার করে বলে উঠবে 'আমরা আবার ফিরে এসেছি।'

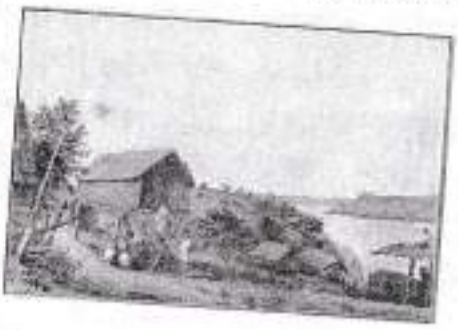

পশ্চিমবাংলার সম্পদ পাহাড় ও জঙ্গলমহল

— কাশীনাথ পাঁজা
(প্রাতঃ বিভাগ, দ্বিতীয়)

সময়ের কালবেয়ে অকে কিছুই ঘটে গেছে কেটে গেছে বহু সময়। অনেক রক্তাক্ত মর্মান্তিক ঘটনা দেখেছি। অকালে মানুষকে শেষ করা, সর্বশান্ত করার এটা ছিল একটা পরিকল্পনা। তারা অনেক কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। নেই ভলো বাড়ী, নেই অর্থ, নেই রাস্তা সুগম, নেই স্কুল, কলেজ, যখন-তখন অন্ধকার, কোনো ভবিষ্যৎ নেই। গভীর ঘন জঙ্গলকে নিয়ে তারা বেঁচে আছে। খাদ্য নেই, গাছের পাতা, মধু খেয়ে দিন কাটাচ্ছে।

সময়টা বহু পাল্টে গেছে। পশ্চিমবংলায় প্রাক্তন মেকী সরকারের পতন ঘটেঠে। আজ জঙ্গলমহল থেকে অন্যায় অত্যাচারীর শাসনের পতন ঘটেছে। এখন আদিবাসীদের দুঃখের দিনের অন্ধকার নেই। আলো বিরাজ করছে।। নতুন নতুন স্কুল হচ্ছে, কলেজ হচ্ছে, পছ ঘাট নির্মাণ করা হচ্ছে। তাদের জন্য খুবই কম অর্থে চাল, গম দেওয়া, এবং চাশের সুবিধার্থে কৃষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হচ্ছে। এখন বাড়ি থেকে সবাই বেরোতে পারছে। জঙ্গলমহল আজ শান্তমহলে পরিণত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের গর্ব অহংকার এবং অর্থনৈতিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রধান সম্পদ দার্জিলিং চা ও কমলালেবুর বিস্কোনা দেশে বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করে পশ্চিমবাংলার অর্থভাণ্ডারকে চাঙ্গা করে দার্জিলিং।

আজ এই দার্জিলিংকেই পর্যটনের অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গণ্য করে সকলেই কিন্তু কেন আমরা পশ্চিমবাংলার মানুষ দার্জিলিংকে আলাদা হতে দেব? কেন তারা অন্য রাজ্যের দাবী করে বাংলার গৌরবকে খর্ব করবে, কেন তারা চেয়েছিলেন যে তারা 'গোর্খাল্যাণ্ড' নামে কোন রাজ্যে উৎপত্তি ঘটাবেন। কেনই বা প্রাক্তন সময়ের মুখ্যমন্ত্রী এর সুষ্ঠু সমাধান করে যেতে পারেন নি। কেন তিনি পাহাড় ও জঙ্গলমহলকে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অবহেলিত, অন্ধকারাচ্ছন্ন রেখেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না, তাদের অন্যের সমালোচনা করা মানায় না।

আজ আমরা দেখেছি পাহাড় শান্ত, পাহাড়ের মানুষ সুখে আছেন, ব্যবসা বাণিজ্যের পথকে আরো প্রসার করছেন পর্যটনের হাত ধরে। টীন আসছে, ব্রিটেন আসছে, আমেরিকা দেশি বিদেশি শিল্পপতিরা এরাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের সঙ্গে উদ্যোগী হচ্ছেন।

এই সব খিটুই সম্ভব হয়েছে আমাদের নতুন বাংলা, প্রগতির বাংলা। নতুন সরকারের চেষ্টা, উদ্যোগের ফলে।

শিশু-কিশোর মাণিক

— ড. আসরফী খাতুন

আশৈশব বেপরোয়া স্বভাবের শিশুটি প্রায় মাঝে মাঝেই স্কুল পালিয়ে মাকে কাঁদিয়ে টাঙাইলে নদীর ধারে নোঙর করা নৌকোয় মাঝি মল্লারদের সঙ্গে দু-চার দিন কাটিয়ে আসতেন। কখনো বা বাবা-মার শাসন ভীতিকে বেপরোয়া না করে ঘোড়ার গাড়ির গারোয়ানদের সঙ্গে রাত কাটিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কখনো বা মেদিনীপুরে লাল ধুলোভরা শহরের নোংরা লোকালয়ের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে খেলা করে দিন কাটাতেন।

লেখকের ভাষায় -- ''ছেলেবেলা থেকেই গিয়াছিলাম পেকে। অল্প বয়সে 'কেন' রোগের আক্রমণ খুব জোরালো হলে এটা ঘটবেই। ভদ্র জীবনের সীমা পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল নীচের স্তরের দরিদ্র জীবনের সঙ্গে। উভয় স্তরের জীবনের অসামঞ্জস্য, উভয় স্তরের জীবন সম্পর্কে নানা জিজ্ঞাসাকে স্পষ্ট ও জোড়ালো করে তুলত। ভদ্র জীবনে অনেক বাস্তবতা কৃত্রিমতার আড়ালে ঢাকা থাকে গরীব অশিক্ষিত খাটুয়ে মানুষের সংস্পর্শে এসে ওই বাস্তবতা উলঙ্গরূপে দেখতে পেতাম, কৃত্রিমতাকর আবরণটা আমার কাছে ধরা পড়ে যেত। মধ্যবিত্ত সুখী পরিবারের শত শত আশা আকাঙ্খা অতৃপ্ত থাকায়, শতশত আয়োজন না মেটায় চরম রূপ দেখতে পেতাম নিচের তলার মানুষের দরিদ্রপীড়িত জীবনে। আসলে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা যত গভীর ও ব্যাপক হয়েছে ততই তিনি মানুষের জীবনের বেদনার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পরেছেন।

পিতা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা নীরদা সুন্দরী দেবীর পঞ্চম সন্তান মানিককে বড়ো হতে হয় আট ভাই ও ছয় বোনের অন্তর্গত একান্নবর্তী পরিবারে। ফলে পারিবারিক উদাসীনতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর বেপরোয়া বেহিসেবী বিশৃঙ্খল জীবনের দিকে ঝোঁক। আবার অসীম সাহসিকতার জন্য মাত্র পাঁচ-ছয় বছর বয়সে কুয়ো থেকে ছোটো ভাইকে উদ্ধার করে জ্যেষ্ঠ ভগ্নীপতির কাছে পান পুরস্কার। আবার কখনোবা উদ্ভূত খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে আলমারি চাপা পড়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনেন। দুর্বুদ্ধি, পাকামি ও গোঁয়ারতুমির জন্য দাদাদের কাছে বহুবার শাস্তি পেতেও হয়েছে। সাঁওতাল পরগণার দুমকা শহরে ১৯০৮ সালের মে মাসে (১৩১৫ বঙ্গাব্দের ৬ই জ্যৈষ্ঠ) যে শিশুটির জন্ম হয়েছিল কেউ ভাবতেও পারে নি এই ছোট্ট শিশুটি বড়ো হয়ে দোর্দণ্ডপ্রতাপ, অসাধারণ প্রতিভাধর, দৃঢ়চেতা মানিক হয়ে বাঙালির চিত্তকে জয় করে নেবে।

শৈশব থেকেই তাঁর বেপরোয়া স্বভাবের জন্য তিনি বহুবিধ দুর্ঘটনার শিকার হন। শৈশবেই বঁটিতে গুরুতর আহত হলে তাঁর পেট সেলাই করার সময় তিনি কাঁদেন নি, ব্যথার যন্ত্রণায় অন্য শিশুরা তীব্রভাবে কাঁদলেও তিনি নাকি কান্নার পরিবর্তে গান গাইতেন। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি বাজী তৈরী করতে গিয়ে পুনরায় গুরুতর আহত হন এবং তাঁর শরীর থেকে কাঁচের টুকরো বের করার সময় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অসাধারণ সহ্যশক্তি দেখে চিকিৎসক মানিকের বাবাকে

বলেছিলেন, 'এ তো আশ্চর্য ছেলে, একটুও শব্দ করল না!' শালবনিতে থাকার সময় তিনি প্রায়ই স্কুল না দিয়ে শালবনের গভীর অভ্যন্তরে চলে যেতেন। তবে স্কুলে একবার উপস্থিত হলে আর তিনি পালাতেন না। মহিষাদল টাঙ্গাইলে ব্রাহ্মণ বাড়ি যায় স্কুলজীবনে ক্লাসের পড়া তাঁর একেবারে ভালো লাগত না। খেলার ঝোঁক ছিল বেশি, ছোটো বড় যে কোনো ঘটনা নিয়ে নির্জনে বসে চিন্তা করতে ভালো লাগত। টাঙ্গাইলে স্কুলে পড়ার সময় বর্ষা সম্পর্কে রচনা লিখলে বাংলা শিক্ষক সতীশবাবু সেটি পড়ে সহপাঠীদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন অন্যদের সঙ্গে মানিকে স্বাতন্ত্র কোথায়।

ছাত্র হিসাবে স্কুল জীবনে মানিকের যথেষ্ট সুনাম ছিল। নামকরা স্কুল মিত্র ইনস্টিটিউশনে তাঁর শিক্ষা শুরু হলেও পরে সেখানে পাঁচ ছয় বছর শিক্ষালাভের পর তিনি মায়ের মৃত্যুর জন্য বড়বোনের শ্বশুরবাড়ি মেদিনীপুরে জেলা স্কুল থেকে ১৯২৬ সালে আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক গণিতে লেটার পেয়ে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। ১৯২৮ সালে বাঁকুড়ায় ওয়েসেলিয়ান মিশন কলেজ থেকেও প্রথম বিভাগে আই.এস.সি. পাশ করে তিনি প্রেসিডেনসী কলেজে অঙ্ক শাস্ত্রে অনার্স নিয়ে বি.এস.সি.তে ভর্তি হন। পিতৃদেব হরিহরই মানিকের পরীভার ফল দেখে খুশী হয়ে তাঁকে এনে কোলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি করেন। এই প্রেসিডেন্সীতেই ছাত্র অবস্থায় 'অতসীমামী' প্রকাশিত হলে মানিক বুঝতে পারেন--

'বন্দরে বন্ধনকাল এবারের মত হল শেষ। নতুন সমুদ্রতীর পানে দিতে হবে পাড়ি।' মানিক আমৃত্যু পিতাকে অপরিসীম ভক্তি করতেন এবং ১৯৫২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর তারিখে পিতার কাছ লেখা তাঁর একটি অসমাপ্ত পত্রের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করলে পিতার প্রতি পুত্রের অসীম শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়--

'পিতা হিসাবে আপনি শুধু আমার নমস্য নন, লাখ লাখ লোকের নমস্য হয়ে রইলেন। বিক্রমপুরের গাঁয়ের একটি ছেলে কোনমতে বি.এ. পাশ করে যে সুধাংশু আর মাণিককে সৃষ্টি করতে পারে -- একই বাংশ বৈজ্ঞানিক আর সাহিত্যিক সৃষ্টি করতে পারে, এ গৌরব বাংলার একমাত্র আপনি পেয়েছেন।'

মানিকের মা নীরদাসুন্দরী 'পুতুল নাচের ইতিকথা'য় (১৯৩৬) উল্লিখিত গাওদীয়া গ্রামের মেয়ে ছিলেন। মানিকের যখন মাত্র ষোল বছর বয়স তখন ১৯২৪ মে টাঙ্গাইলে ডবল নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে চৌদ্দটি সন্তানের জননী পরলোক গমন করেন। এই সামান্য কয়েকটি ঘটনা ছাড়া তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্য জীবনে জননী সম্পর্কে মানিক আশ্চর্য রকম নীরব, অবশ্য তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাসের নামই 'জননী' (মার্চ ১৯৩৫)।

তবে পিতা সম্পর্কে আমৃত্য সমান শ্রদ্ধা ভক্তির নিদর্শন রেখে গেছেন তাঁর বড়দা বিজ্ঞানী সুধাংশু কুমারকে লেখা একটি সুদীর্ঘ পত্রে। বৃদ্ধ পিতা যখন নিজবাড়ি বিক্রয় করে পুত্রদের মধ্যে টাকা বন্টন করে দিতে বাধ্য হয়। তারপর পিতাকে আর কেউ নিজ গৃহে রাখতে চাননি। অসুস্থ মানিক তাঁর দারিদক্লিষ্ট সংসারে চার সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত ছাকা সত্ত্বেও কোনদিন পিতাকে দূরে সরিয়ে দেন নি। আমৃত্যু নিজের কাছ রেখে সেবাযত্ন করে গেছেন। এমনকি পিতাকে দশ পনেরো টাকা অতিরিক্ত সাহায্য করার জন্য চা-সিগারেট থেকে

শুরু করে প্রয়োজনীয় ঔষধ খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ করতে বাধ্য হন। বড়দার নির্মম, নির্দয় ব্যবস্থায় তাঁর সংবেদনশীল মন প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। পত্রটির কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হল--

'.....আপনি যেরূপ কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছেন তাহাতে বাবা যদি বা আর ২-৪ বৎসর বাঁচিতেন তাহা আর বাঁচিতে পারিবেন না। আপনার এক একখানি পত্র আসিতেছে আর বাবার কয়েক রাত্রি ঘুম হইতেছে না এবং সবসময় উত্তেজিত হইয়া থাকিতেছেন.....

.....ফল না খাইয়াও বাবা কিছুদিন বাঁচিতে পারিবেন কিন্তু এই বয়সে রাত্রে না ঘুমাইয়ে বেশি দিন বাঁচিবেন না।

....স্নেহ-মমতা, সহৃদয়তা এবং ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার ছাড়া জগতে কেহ কাহারও মানসিক জগতে উন্নতি সাধন করিতে পারে না। পৃথিবীতে আদর্শ, সৎদৃষ্টান্ত এবং উপদেশ দিবার লোকের অভাব নাই। কিন্তু প্রীতি ও মমতার সঙ্গে না দিলে কোনো উপদেশ বা দৃষ্টান্তেই কাজ হয় না।

.....এখন হইতে পূর্বে যাহা দিতাম তাহার চেয়ে ১০-১৫ টাকা অতিরিক্ত দিবার জন্য ঔষুধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। ঔষধ অপেক্ষা মানসিক শান্তি বেশি উপকারী হইবে। সাতদিন পূর্ব হইতে চা সিগারেট কমাইতে আরম্ভ করিয়াছি, আর সাতদিন পর সম্পূর্ণ ছাড়িয়া দিব।'

জাতীয় জীবনের এই কলঙ্কিত ঘটনাটি ঘটে ১৯৪৬ সালে। সেই কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুর্যোগ মুহূর্তে তাঁর প্রাণের মায়া তুচ্ছজ্ঞান করে তিনি ঐ সমস্ত এলাকায় অসীম সাহসিকতার সঙ্গে সামাজিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। বালিগঞ্জে পরিবারের সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে তিনি টালিগঞ্জের বাড়িতে একলা থেকেছেন এবং অসুস্থ পিতার নিত্য আহার্য মাগুর মাছের বন্দোবস্ত করে প্রত্যহ বালিগঞ্জে দিয়ে আসতেন। আশ্চর্য পিতৃভক্তির নিদর্শন মেলে তাঁর এই আচরণে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তির গল্প আমরা সবাই জানি। দারিদ্রক্লিষ্ট দুরারোগ্য ব্যধিজনিত অসুস্থ মানিকের এহেন পিতৃভক্তি ও তাঁর পাশাপাশি সমানভাবে ঠাঁই করে নিতে পারে। জীবনকে তুচ্ছ করে পিতাকে সুস্থ রাখার মানসিক শান্তি দেবার তাঁর এই প্রচেষ্টা সত্যিই নজিরবিহীন। ১৯৪৯ থেকে বরানগর গোপাললাল ঠাকুর রোডে স্থায়ীভাবে বসবাস কালে পিতৃসেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন আমৃত্যু। একটি মাত্র ঘরের মধ্যবর্তী পার্টিশনের দুইপাশে আশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে অর্ধবয়স্ক দারিদ্র পীড়িত এবং সামাজিক দিক দিয়ে বিধ্বস্ত পুত্র একটানা প্রায় সাতবছর অতিবাহিত করেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে ছাত্রাবস্থায় তাঁর প্রথম গদ্যরচনা 'অতসী মামী' গল্প (বিচিত্রা পত্রিকায় প্রকাশিত)। তারপর তাঁকে ফিরে তাকাতে হয়নি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের মতে 'একটি লেখাতেই মানিকের আবির্ভাব অব্যর্থিত হল'। ১৯২৮ থেকে ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত 'বিচিত্র', 'বঙ্গশ্রী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় মানিকের কালজয়ী রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। যেমন 'জননী' (মার্চ ১৯৩৫), 'অতসী মামী ও অন্যান্য গল্প' (ডিসেম্বর ১৯৩৫), 'পুতুল নাচের ইতিকথা' (১৯৩৬), 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬), 'জীবনের জটিলতা' (নভেম্বর ১৯৩৬)। অত্যধিক পরিশ্রমের জন্য এই সময় থেকেই মানিক মৃগীরোগ আক্রান্ত হন। এই রোগ সম্পর্কে একটি চিঠিতে তিনি জানান--

'আমার যতদূর বিশ্বাস, সাহিত্য ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি নাম করিবার জন্য স্বাস্থ্যকে সম্পূর্ণ অবহেলা করাই আমার এই অসুখের কারণ। এক বৎসর চেষ্টা করিয়া যদি আরোগ্যলাভ না করিতে পারি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব আমার যে অত্যন্ত উচ্চ ambition ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে সফল করিতে পারিব না। আংশিক সাফল্য লইয়াই সাধারণভাবে আমাকে জীবন কাটাইতে হইবে। এভাবে থাকিবার ইচ্ছা আমার নাই।

জীবনের শুরুতে এই আঘাত তাঁর অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত করে তোলে এবং সেই বিপন্ন ও বিধ্বস্ত জীবন নিয়ে মানিক যে স্বকীয় পদ্ধতিতে আমৃত্যু সংগ্রাম চালিয়ে যান তা স্মরণীয়। ছয়-সাত বছরের জন্য ডাক্তারের হাতে নিজেকে সমর্পণ করেও কিছু লাভ হয়নি। ঝিমিয়ে দেওয়া ওষুধ খেয়ে খেয়ে তিনি ধীরে ধীরে প্রায় অকর্মণ্য হয়েও পড়েছিলেন এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। ইতিমধ্যে তিনি নিজের অসুখ সম্পর্কে ডাক্তারি বই পড়তে শুরু করেছিলেন এবং সেখান থেকে জেনেছিলেন তাঁর অজ্ঞান হওয়ার কারণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই তিনি নিজের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজেই নিলেন। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন আর নিজেরে রোগী ভাববেন না। কোন চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়েই তিনি একটা পেটেন্ট ওষুধ তৈরী করে ব্যবহার করতে থাকেন। তৎকালীন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ নারায়ণ রায় তাঁর ঐ পেটেন্ট ওষুধ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন - 'It was the correctr medicine' ভাবা যায় একজন মানুষ, সাহিত্যিক মানুষ হয়েও নিজস্ব মানসিক ক্ষমতায় আমৃত্যু জীবনের সঙ্গে কিভাবে সংগ্রাম করে গেছেন মাত্র ২৬-২৭ বছর বয়সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ, মরনাপন্ন লেখক কিভাবে নিজেরই নিজের বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। অলস অকর্মণ্যভাবে গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে কিভাবে স্রোতের প্রতিকূলে লড়াই চালিয়েছেন। তা না হলে তাঁর এই অফুরন্ত অমূল্য রত্নরাজী তুল্য রচনাসম্ভার কি কোনোদিন আমরা লাভ করতাম?

এ হেন মানিক কিশোর বয়স থেকেই সংসার ও সমাজ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে শুরু করেছিলেন এক নিরাসক্ত নিরারোগ বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে। নিঃসঙ্গ নির্বান্ধব অবস্থায় কৈশোরে মাতৃহীন এই দুর্দান্ত বেপরোয়া মানুষটি কিন্তু কল্পনার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে ভিন্‌দেশে কোন রাজকন্যার খোঁজে না গিয়ে মাটির পৃথিবীর ক্লিন্ন আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছিলেন। তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল পরিণত মানুষদের চেতনানুসারী। কাজে কর্মে কিছু ছেলেমানুষির প্রমাণ থাকলেও তাঁর খুব অল্প বয়সেই রুচি ও প্রবণতা ছিল সংসারাভিজ্ঞ মানুষের মত জীবনের জটিল গ্রন্থি উন্মোচনে। কল্পরাজ্যে পরিভ্রমণ তখন তাঁর পক্ষে বিলাসিতা মাত্র। তিনি তখন মানব মনের যাবতীয় অসংগতি ও সমাজ জীবনের সর্বপ্রকার বিশৃঙ্খলার সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত বৈজ্ঞানিক।

শিশু সাহিত্যে মানিকের অবদান পরিমাণগত বিচারে নিতান্তই সামান্য, শিল্পগুণগত মানদণ্ডেও সেগুলির উৎকর্ষ খুব বেশি নয়। তবু তিনিও সে শিশু-কিশোরদের কথা খুব সামান্য হলেও ভেবেছিলেন তারই খোঁজ করব।

'আমার কান্না', 'বড়ো হওয়ার দায়' বা 'অলৌকিক লৌকিকতা' রচনাগুলি মানিকের স্মৃতিকথা পর্যায়ের কয়েকটি ঘটনামাত্র। নানাবিধ বিপর্যয়ের বেড়া ডিঙিয়ে চণ্ডীচরণের সংগীত

শিক্ষার ব্যর্থ প্রয়াসের করুণ কাহিনি 'চণ্ডীচরণের গান'। বৈদ্যুতিক কারসাজির মাধ্যমে একটা অলৌকিক প্রাণান্তকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার গল্প 'তৈলচিত্রের ভূত'। আর একটি ভৌতিক গল্প 'পোড়ো ছায়া'। আসলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত একটি পোড়ো বাড়িতে আশ্রয় প্রাপ্ত একটি পরিবারে অশরীরী ছায়ার অস্তিত্ব দেখে ভয় পাওয়ার অতি সাধারণ পর্যায়ের ভৌতিক গল্প, দুই বন্ধুর পারস্পরিক ভয় দেখানোর বিষাদান্তক বিবরণ 'ভয় দেখানোর গল্প', লেখকের ফ্রয়েডচর্চার উদ্ভট খেয়ালিপনার ছাপ রয়েছে 'শৈশব স্মৃতি যাচাই করার গল্প'তে। অবশ্য ফ্রয়েডচর্চার নিদর্শন স্বরূপ এই গল্পটি কিশোর সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত নয় বলেই মনে হয়। তরুণ লেখকের সম্পর্কে মানিকের নির্দেশাত্মক বক্তব্য প্রকাশিত 'গল্প চুরির গল্প' এবং 'তিনটি সাহসী ভীরুর গল্পে' তিনজন আপাত সাহসীর হৃদয় দৌর্বল্যের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ শিশু বা কিশোরদের কাছে খুব একটা আদরনীয় না হলেও 'টিকিট নেই' গল্পটি সত্যিই ছোটোদের মনোহরণ করে। বিনা টিকিটে ট্রেন ভ্রমণ করা কোশলে রীতিমতো পারদর্শী মায়াধর একদা সুকৌশলে কিভাবে জনবহুল হাওড়া প্লাটফর্ম থেকে টিকিট চেকারের চোখে ধুলো দিয়ে জনা পনেরো ওড়িষাবাসীর নর-নারীকে মুক্ত করে নিয়ে এসেছিল তারই সরল অথচ বাস্তব বর্ণনা রয়েছে এই 'টিকিট নেই' গল্পে। 'পাশফেল" গল্পটিতে শিশু কিশোরদের যে প্রকৃত শিক্ষা বা নীতিশিক্ষা তিনি পরোক্ষে দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিষয় ও ঘটনা তাঁকে প্রতিনিয়ত ক্ষতবিক্ষত করেছে, আলোড়িত করেছে। 'আর না কান্না' গল্পে দুর্ভিক্ষের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে আর্তনাদ করেছে এক নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি ও ছোট ছোটি ছেলেমেয়েদের উপবাসী মুখগুলি যে কোন মানুষকে অভিভূত করবে। সাত বছরের ক্ষুধার্ত শিশু যখন তার মায়ের মুখের উপর তীব্র জ্বালায় ফেটে পড়ে তখন মানিক সরাসরি পাঠকের সামনে আবির্ভূত হন-- 'হে রাত আটটার তারায় ভরা আকাশ, একবার বিদীর্ণ হও। কোটি বজ্রের গর্জনে ফেটে চৌচির হয়ে যাও। আমার বাংলার ছেলেমেয়েরা আজ খিদেয় কাতর হয়ে একখানা রুটির জন্য, এক মুঠো ভাতের জন্য সংগ্রাম শুরু করেছে নিরুপায় মায়ের সঙ্গে।' মানিকের এই উপলব্ধি অনুজ কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা মনে করায়--

'হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো,
পদলালিত্য ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা-
কবিতা, তোমায় দিলাম আজকে ছুটি
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়
পূর্ণিমার-চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।'

(হে মহাজীবন, 'ছাড়পত্র')

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির 'ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প' (জুন ১৯৫৮)। (ভয় দেখানোর গল্প, শৈশব স্মৃতি যাচাইয়ের গল্প, গল্পচুরির গল্প, সিদ্ধপুরুষ, তিনটি সাহসী ভীরুর গল্প, তৈলচিত্রের ভূত, টিকিট নেই, অসহযোগী, চণ্ডীচরণের গান, অলৌকিক লৌকিকতা, পাশফেল, আমার কান্না) প্রকাশ করে। শিশু সাহিত্যে মানিকের অবদান সম্পর্কে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের ১ লা বৈশাখ গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড মাণিকের

একটি পুরানো উপন্যাস, পাঁচটি পুরানো এবং পাঁচটি নতুন গল্পের সংকলন 'কিশোর বিচিত্রা' (এপ্রিল ১৯৬৮), (মাঝির ছেলে উপন্যাস এবং ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্পে সংকলিত 'আমার কান্না' চণ্ডীরামের গান, অলৌকিক লৌকিকতা, অসহযোগ, তৈলচিত্রের ভূত বাদে, বড় হওয়ার দায়, সনাতনী কাণ্ডকারখানা এবং পোড়াছাড়া) গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে। মাত্র ৪৮ বছর জীবনকালের তিনি রচনা করেন মোট ৩৫টি উপন্যাস, ১৬টি গল্প সংকলন, ১টি প্রবন্ধ সংকলন (লেখকের কথা, সেপ্টেঃ ১৯৫৭), ১টি নাটক (ভিটেমাটি, মে-১৯৪৬) এবং প্রায় ১০০ টি কবিতা। (১৬ থেকে ২১ বছর বয়সের মধ্যে)।

সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও গুরতর অসুস্থ মানিককে ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইসলামিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয় লেখকের হিতৈষী ও প্রীতিকামী বন্ধুদের সক্রিয় সহায়তায়। এ ব্যাপারে মুজফ্‌ফর আহমেদ, জ্যোতি বসু, অতুল গুপ্ত, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন।

হাসপাতালের রোগশয্যায় শুয়েও ভারতে শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় মানিকের তীব্র ও ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে পার্টির কমরেডদের কাছে সর্বদা রাজনৈতিক সংবাদ শুনতেন এবং 'পরাধীন প্রেম' (মে ১৯৫৫) উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন। অসাধারণ মনের জোর ছিল তাঁর তাই তিনি হাতাকাঙ্খী অতুল গুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখতে পেরেছিলেন - 'চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলে আমার সর্বনাশ হবে - আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার কোন রোগ নেই, আমি সুস্থ সবল সক্রিয় মানুষ।'

সমগ্র সাহিত্য জীবনে মৃগীরোগ তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। জীবনের শেষ বছরে রক্ত অমাশয় ও যকৃতের পীড়া তাঁকে মরণের প্রান্তে পৌঁছে দিল। ৩০ নভেম্বর তিনি হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রায় ষাট ঘণ্টা শোচনীয় ও অসহায় সাংসারিক পরিবেশে কাটানোর পর তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় নীলরতন সরকার হাসপাতালে ২ ডিসেম্বর, রবিবার রাত দশটায়। ১৯৫৬ সালের ৩রা ডিসেম্বর সোমবার (১৩৬৩ বঙ্গাব্দের ১৭ অগ্রহায়ণ) ভোর চারটেয় তিনি ঐ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সকালে বেতারে প্রচারিত হল এই নিদারুন দুঃসংবাদ, সমাজের বিভিন্ন স্তরের বহু মানুষ হাসপাতালে তাদের প্রিয় লেখককে শেষ বারের মতো দেখতে এসেছিল। মানিকের মৃত্যুর অব্যবহতি পরেই তখনকার বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সমসাময়িক পত্রে তাঁকে নিয়ে সম্পাদকীয় ও বিশেষ নিবন্ধ লেখা হয়। ৮ ডিসেম্বর প্রকাশিত 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয় - 'মানিকবাবু ছিলেন জীবনবাদী সাহিত্যিক। জীবন সমুদ্রকে মন্থন করিয়া যে অমূল্য রত্নরাজী তিনি আহরণ করিয়াছিলেন, দেশবাসীর হাতেই তিনি তাহা তুলিয়া দিয়াছেন। মন্থনের পরিণামে শুধু অমৃত ওঠে নাই, হলাহলও উঠিয়াছিল। সেই হলাহল তিনি আপন কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র বা তারাশংরের মতোই তিনিও কাব্যচর্চা দিয়েই সাহিত্যক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হন। ঔপন্যাসিক ও ছোটোগল্পকার হিসাবে মানিক বাংলা সাহিত্যের অঙ্গিনায় বহু বিষয়ে স্বাতন্ত্র দেখালেও অন্তত এই একটি বিষয়ে তিনি পূর্বসূরীদেরই পথ অবলম্বন করেছেন। ষোল থেকে একুশ বছরের মধ্যে লিখেছিলেন প্রায় একশোটি কবিতা। তাই সুকান্ত ভট্টাচার্য্যকে নিয়ে লেখা কবিতা দিয়ে একটি শিশু কিশোর মানিকের এই আলোচনার ইতি টানব।

সুকান্ত ভট্টাচার্য শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শে সমগোত্রীয় নন, তিনি কবি হিসাবেও ছিলেন আদর্শসম্ভূত শিল্পী। 'মাটির কাছের কিশোর কবি'তে রয়েছে সুকান্তের ছায়া। যখন মানিক নিজের জীবনেই শুনেছিলেন মৃত্যুর পদধ্বনি তখন তিনি অনুজ যক্ষারোগাক্রান্ত কবির জন্য অসুস্থ শরীরে তাঁকে নিয়ে কবিতা রচনা করে সুকান্তের প্রতি অসীম ভালোবাসা ও সহানুভূতির সঙ্গে পাশে দাঁড়াতে চেয়েছেন। সুকান্ত ভট্টাচার্যের মধ্যে যে বিদ্রোহী আত্মার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন যা শোষণ বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' কবিতায় মানিক লিখেছেন--

তোমার যক্ষা হয়েছে?
এও বুঝি ষড়যন্ত্র রাত্রিজ মেঘের
উষায় যারা আজ দুর্যোগ ঘটালো।

....

কবি ছাড়া আমাদের জয় বৃথা
বুলেটের রক্তিম পঞ্চমে কি চিরবে
ঘাতকের মিথ্যা আকাশ?
কে গাইবে জয়গান?

গ্রন্থঋণ ঃ

১। মানি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজ জিজ্ঞাসা-- ডঃ নিতাই বসু।
২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্য-- ডঃ সরোজমোহন মিত্র
৩। মানিক রচনাবলী -- পঃ বঃ বাংলা একাডেমী, ২০০২ (৩য় সংস্করণ)
৪। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা --যুগান্তর চক্রবর্তী, সম্পাদিকা-কবিতা সংকলন
৫। ছোটোদের শ্রেষ্ঠ গল্প - অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির।
৬। কিশোর বিচিত্রা - গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড।
(শারদীয়া লালপরি নীলপরি, অক্টোঃ ২০০৫, সম্পাঃ- আসরফী খাতুন, ৫৭ ডি.এন.মিত্র রোড, ১নং পাকমারা গলি।)

"চোখের সামনে মানুষ অনাহারে মরবে, ব্যাধি, জরা, মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে আর দেশের মানুষ চোখ বুজে ভগবান ভগবান করবে। এমন ভগবৎ প্রেম আমার নেই, আমার ভগবান আছেন মাটির পৃথিবীতে।"

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

তুমিই সুন্দরী

— বিশ্বজিৎ বিশ্বাস
(বি.এ. ৩য় বর্ষ) (যুগ্ম সম্পাদক)

বাসন্তী রঙের শাড়ী, সোনালি ঝুমকো কাজল আর ছোট্ট একটি মায়াবী কালো টিপ....আজ সরস্বতী পুজো..সোনাক্ষীকে আজ বড়ই সুন্দর লাগছে। তবে একথা তাকে কে বোঝায়। সকাল থেকে কমপক্ষে কুড়ি বার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের রূপ বিচার করা হয়ে গেছে তার। কখনও চুলটা কে কাঁধে ফেলে দেখে, তো কখনও কানে পিছনে দেয়। আবার কখনও কালো টিপের জায়গায় লাল টিপ পরার কথা ভাবে। মাসি, কাকু, মা, দিদা, মৌমিতা, নিশা সকলে ওকে হাজারবার বলেছে যে, ওকে খুব সুন্দর দেখতে লাগছে। দিদা তো ওর চিবুক ধরে আদর করে 'রাণি রাসমণি' পর্যন্ত বলে দিয়েছে। নিশা তো ওকে শ্রীদেবী পর্যন্ত বলতে বাকি রাখেনি! সোনাক্ষী কিন্তু কারও কথাতেই যেন ভরসা পাচ্ছে না। সে নিজে খুব ভালে করেই জানে যে, তাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, কিন্তু তার চিন্তা অন্য..... মন্দিরার সাজ যদি আজকে তার সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে যায়।

সকলে জানে, সে নিজেও জানে, সে মন্দিরার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর! মন্দিরার নাক বোঁচা, আর গায়ের রঙ কালো। কিন্তু সব সবসময়ই সে এমন সেজেগুজে থাকে যে লোকে তার দিকে ঘুরে দেখতে বাধ্য হয়। তা দেখুক, সোনাক্ষীর রূপেও কারও চোখ এড়ায় না! আসলে সমস্যাটা সূর্যকে নিয়ে। সূর্য সবসময় মন্দিরার প্রশংসায় পঞ্চমুখ! মুখে না বললেও তার চোখ জানিয়ে দেয় কথাটা। হয়তো সকলে মিলে ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা মারছে, তার মধ্যে হঠাৎ যদি মন্দিরা এসে পড়ে, তা হলে সূর্যের মুখের কথা থেমে যায়, গালে আপনা-আপনি সূক্ষ্ম টোলটা দেখা যায়। সোনাক্ষীর ভিতরটা জ্বলতে থাকে, মন্দিরার প্রতি রাগ আরও বেড়ে যায়।

"হেমাদি, এই নিয়ে সাতাশবার হল।' মঞ্জরী কপালে ভ্রুকুটি নিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সোনাক্ষী আয়নার সামনে থেকে উঠে গিয়ে দরজার সামনে চেয়ারে বসল। সামনের কাচের আলমারির দিকে তাকিয়ে, মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। নিশা চুটে এসে খবর চিল সূর্য আর বন্ধুরা এসে গিয়েছে। সোনাক্ষী ব্যস্ত হয়ে উঠে পড়ল। আর একবার আয়নায় মুখ দেখতে সিঁড়ি দিয়ে ছুটে নেমে গেল সে। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট হয়ে গিয়েছে। সরস্বতী পুজোর দিনে মেয়েদের ক-অ-অ-ত সুন্দর লাগে, এই নিয়ে সূর্য অনেক কথাই বলেছে। কিন্তু একবারও মুখ ফুটে সোনাক্ষীকে কেমন লাগছে বা তার সাজ নিয়ে কোন কথা বলেনি। সোনাক্ষী মিষ্টি দিতে গিয়ে কখনও আলতো করে ঘাড়ের ওপর থেকে চুলটা সরিয়েছে, ঘুরে দেখার সময়ে আঁচলটা উড়িয়ে দিয়েছে। সূর্যের যেন সেদিকে চোখই গেল না!

বেশ অনেকটা সময় কেটে গেল। সোনাক্ষী আর পারছে না। তার ভিতরটা উথালপাতাল করছে সূর্যের মুখে দুটো মিষ্টি কথা শোনার জন্য। সে আর থাকতে না পেরে নিজেই বলে বসল যে আজ তার দিদা তাকে 'রাণি রাসমণি' বলেছে। কথাটা শেষ করবার আগেই পিছন থেকে কেউ সূর্যের চোখ টিপে ধরল। সূর্য একগাল হেসে চোখ থেকে সেই হাত দুটো নামাতে নামাতে বলল, 'পাগলি কোথাকার'! সোনাক্ষী মন্দিরার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল। কিন্তু মন্দিরার সাজ দেখে সে আশ্বস্ত হল। না! আজ তাকে মন্দিরার চেয়ে দেখতে সুন্দর লাগছে। মন্দিরা

বসা মাত্র সকলে তাকে দেরি করে আসার জন্য বকাবকি করতে লাগল। আবদার করা হল যে শাস্তি হিসাবে তাকে এমনই একটা গান গাইতে হবে। মন্দিরাও চট করে গান ধরল 'প্রাণ চায়, চক্ষু না চায়.....'। গান শেষ হওয়া মাত্র হাততালিতে ঘর ভরে গেল। সূর্য বলল 'এতক্ষণে এনজয় করা শুরু করছি! রবি ঠাকুর দিয়ে শুরুটা বেশ ভালো হল। এবার একটা 'মহীমের ঘোড়াগুলি'-র গান হয়ে যাক.....। সোনাক্ষীর বুকে যেন সমুদ্রের মতো বড় বড় ঢেউ আছাড় খেতে লাগল। সে কাজের ছুতো করে ঘর ছেড়ে চলেগেল। সেইদিন রাতে সোনাক্ষীর চোখে ঘুম এল না। তার পরের দিনও এল না। সে ভাবতে লাগল। সে গান গাইতে পারে! সোনাক্ষী মনে মনে ভাবতে ঠিক করল, সে যে অনেক বেশি সুন্দর ও গুণবতী তা সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে .... বিশেষ করে সূর্যকে। পরের দিন সোনাক্ষী নাচের গ্রুপের মেয়েদের জানাল যে তারা পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যটি পরিবেশন করবে।

'আমি কি বললাম জানিস?' সোনাক্ষী উত্তর না দেওয়ায় সূর্য নিজের হাতটা তার হাতের উপর রেখে বলল 'আমি জানতাম যে, ও খুব ভালো নাচে! ও ভাল করেছে এটাই তো স্বাভাবিক।'

সোনাক্ষী এবারও কোন উত্তর দিল না। সূর্য আরও একটু কাছে এসে বলল, 'তুই রাগ করছিস হেমা? বিশ্বাস কর, বাবার শরীরটা সত্যি হঠাৎ করে খারাপ হয়েছিল। না হলে আমি কখনও এরকমভাবে চলে যায়! তা ছাড়া আমি তো জানতাম যে তুই খুব ভালো নাচিস! এবং শ্যামা....."

সোনাক্ষী ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'থাক্। আমি রাগ করিনি। নাচটা দেখে তারপর না হয় প্রশংসা বা নিন্দা করিস'। কিছুক্ষণ চুপ থেকে সে বলল, 'এর পরের বার 'চিত্রাঙ্গদা' করব ভাবথি। তারই চিন্তাভাবনা নিয়েই একটু ব্যস্ত হয়ে রয়েছি। এখনও বুঝে উঠতে পারছি না আমি সুরূপা না কুরূপা' এই বলে সে জানালা দিয়ে যে মাঠটা দেখা যাচ্ছে সেটা আর সোনাক্ষীর জগতের শেষ নয়। সেটা পার করে আরও অনেক অনেক জায়গা আছে.....দৃষ্টি নাই ধরতে পারুক , তা বলে কিন্তু সেগুলো অবাস্তব নয়! আছে.... সমুদ্র আছে....মরুভূমি আছে.....সব আছে! এই জগতেই আছে! এই জগতে যেখানে সোনাক্ষীর সৌন্দর্য আছে, তার নাচ আছে।

সোনাক্ষী বইটা কোলে নিয়ে গানের কথাগুলো পড়তে লাগল। হঠাৎ নিজেই থেমে গিয়ে একরাশ উচ্ছাস নিয়ে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নাচের ভঙ্গিমায় নিজের সুরে বলল, 'আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী....." তার মনের মধ্যে অপরাজেয় শক্তির আভায় সে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে! তার ঠোঁটের কোণে হালকা হাসি ফুটে উঠল।

"সত্যের জন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্য সত্যকে বর্জন করা যায় না।"

-স্বামী বিবেকানন্দ

বিক্রিয়ার ভূত

— অন্তু কুমার
(অতিথি অধ্যাপক-রসায়ন বিভাগ)

সেই ছোটোবেলা থেকেই শুনে এসেছি রসায়নের ভূত নাকি আমাদের সব্বাইকে তাড়া করে। পরমাণু, অণু, মৌল, যৌগ সব কিভাবে যে একে যে একে অপরের সাছে যুক্ত হয়ে যায় খুঁজেই পাওয়া যায় না ঠিকভাবে। ব্যাপারটা রাসায়নিক বিক্রিয়া হলেও সবটাই যেন একটা ভৌতিক ব্যাপার। আমার ছোট্রোবেলায় আমাকেও ঘুমের মাঝে ভয় দেখিয়েছে। আজ আমি তাই বিক্রিয়ার ভূতেদের ভৌতিক ব্যাপারগুলোকে নিয়ে বিশেষ কথা বলব না। বলব টিন্ এজের কিছু গল্প। এর পিছনেও একটা তত্ত্ব আছে। শুনেছি ভলোবাসাই নাকি পারে 'ভূত ভবিষ্যত' বদলে দিতে। 'ভূত ভবিষ্যত' এর অর্থ আমার কাছে 'ভূতের ভবিষ্যত' অর্থাৎ কিনা রসায়নের পরিপ্রেক্ষিতে বিক্রিয়ার ভূতেদের ভবিষ্যত। টুকরো টুকরো কিছু ঘটনায় ওইসব ভূতেদের জীবনী আলোচনা করব।

তখন আমরা কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। আমার কেমিস্ট্রি অনার্স। কমার্স ডিপার্টমেণ্টে, ফার্স্ট ইয়ারে টুকটুকে, ফর্সা, রাজস্থানী 'বিনীতা' প্রতিদিন কলেজে আসতো। দারুন চার্মিং, এক কথায়- এক দেখাতেই পছন্দ হওয়ার মতো। কেমিষ্ট্রি ডিপার্টমেণ্টের সামনেই কমার্স ডিপার্টমেণ্ট। প্রতিদিনের দেখায় আকর্ষণ তো জাগবেই। বন্ধুদের মধ্যে শর্ত হল আমি যদি ওর সাথে গিয়ে কথা বলতে পারি তাহলেই ক্যাণ্টিনে পার্টি। বিনীতার সাথে একটি রাজস্থানীরই প্রেম ছিল। আমি গিয়ে কথা বললাম। পার্টি পেলাম। কিন্তু বিনীতা আমার বন্ধুত্ব গ্রহণ করল না। এখান থেকেই শুরু হল বিক্রিয়ার ভূতেদের বিভিন্ন ধর্মকথা। বিক্রিয়ার ভূতেদের অনেক নাম -- পরমাণু, অণু, আয়ন ইত্যাদি। এদের ধর্ম হল একে অপরের সাথে যুক্ত হওয়া। এখন আমি বিনীতা বা বিনীতার প্রেমিক রাজস্থানী যুবক প্রত্যেককেই যদি পরমাণু হই তাহলে খেয়াল রাখার বিষয় হল এই যে, কোনো পরমাণু যে কোনো পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় না। যেমন বিনীতা যে রাজস্থানী যুবকটির সাথে ভালো থাকে, তাকে ছেড়ে আমার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায় না। অর্থাৎ বলা যায় "To gain better stabiling one atom combines with another and forms a molecule" বা অধিক সুস্থিতি লাভের জন্যই একটি পরমাণু অপর পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে অণু গঠন করে। আর এই এক পরমাণুর অপর পরমাণুর সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা থেকেই ঘটে বিক্রিয়ার সূত্রপাত।

দর্শন নিয়ে আমি বিশেষ পড়াশোনা করিনি। কিন্তু দর্শন ব্যাপারে সবার মতোই আমারও কিছু সহজাত বোধ আছে। আমার মনে হয় দেহ এবং কথা মানুষের মনের পরিচায়ক। কেউ কারও মন পড়তে পারে শুধুমাত্র তার বাচনভঙ্গী এবং অঙ্গভঙ্গীর মাধ্যমেই। এটাও সেকেণ্ড ইয়ারের ঘটনা। গোপালদার হোটলে খাচ্ছি, রাত্রি তখন সাড়ে আটটা কি পৌনে ন'টা। হঠাৎ দেখলাম, একটা ছেলে, নাম জানি না, দু' কানে দুটো ফোন লাগিয়ে একই কথা বলে যাচ্ছে দুটি মেয়ের সাথে। অবাক হয়ে গেলাম। আমি তারপর Unknown Number এ বহুজনের সাথে বন্ধুত্ব করার চেষ্টা করেছি। একজনের সাথেও সফল হইনি। সোজা

হিসাব ঐ ছেলেটির বাচন ভঙ্গিমায় সেই ক্ষমতা ছিল যা থেকে সে সহজেই অন্য কাউকে আকর্ষণ করতে পারত। অর্থাৎ আকর্ষণ করার ক্ষমতা হল যুক্ত হওয়ার মূল বৈশিষ্ট্য। এখন যদি ধরি ছেলেটি হল কোনো পরমাণুর কেন্দ্রক এবং তার বাচনভঙ্গী হল কেন্দ্রকে বেষ্টন করে রাখা ইলেকট্রনের বিন্যাস-- তাহলে, ইলেকট্রনের বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করেই শুরু হয় পরমাণু থেকে অণু গঠনের খেলা। বিক্রিয়ার একটি সহজ নাম হল ভিন্ন পরমাণুর সক্রিয়তার মাধ্যমে নতুন কোনো অণুর উদ্ভব হওয়ার প্রক্রিয়া। সুতরাং পরমাণুর ইলেকট্রনের বিন্যাসই ঠিক করে দেয় পরমাণুটি কোনো বিক্রিয়ায় ঠিক কতটা সক্রিয় হবে।

ফার্স্ট ইয়ারে তখন সবে ভর্তি হয়েছি। প্রাণেশের সাথে আমার বন্ধুত্ব হল। খুবই সাদামাটা ছেলে। সেকেণ্ড ইয়ারে Studnet Union এ যোগদান করল। মূহুর্তেই প্রাণেস গোটা কলেজে Famous হয়ে গেল। প্রচুর Girl friend ও জুটে গেল। কারণ একটাই, যা যা কিছু ছোটোখাটো অসুবিধা, প্রাণেশ দূর করে দেবে। অর্থাৎ কিনা প্রাণেশের কিছু Facility দেবার ক্ষমতা আছে আর বাকীদের কিছু নেওয়ার ক্ষমতা আছে। সহজ কথায় প্রাণেশের ওপর একটা শীলমোহর এর ছাপ পড়ল। যদি প্রাণেশ পরমাণু হয় তাহলে Student Union এর অতিরিক্ত ছাপটিই হল ইলেকট্রনের ঘনত্ব। অর্থাৎ বিক্রিয়া চলাকালীন কোনো পরমাণুর ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশী থাকে যা সহজেই সে দান করতে পারে এবং যে সমস্ত পরমাণু ঐ ইলেকট্রন গ্রহণ করতে পারবে তার সাথে যুক্ত হবে। সুতরাং বিক্রিয়া হল ইলেকট্রন ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে Give & Take method।

সর্বোপরি, বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে বিক্রিয়া মাধ্যম অর্থাৎ পরিবেশের ওপর। কোনো বিক্রিয়া জলীয় দ্রবণে ঘটে তো কোনো বিক্রিয়া অ্যালকোহলীয় দ্রবণে ঘটে - ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আমার College Life এর Best Friend শিউলীর কথা মনে পড়ল। ইংলিশ অনার্সে পড়ত। আমি ইংরাজীতে সুন্দর কথাবার্তা বলতাম বলেই ও নিজে থেকে আমাকে ফ্রেণ্ডশিপের Proposal টা দিয়েছিল। সহজভাবে বললে আমি যদি ইংলিশে কথা বলতে না পারতাম, ওর সাথে আমার বিক্রিয়াটা I mean, বন্ধুত্বটাই হত না। অর্থাৎ আমরা যদি দুটি ভিন্ন পরমাণু হই তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার মাধ্যম হল আমার ইংরাজীতে কথা বলতে পারা'টা। সুতরাং উপযুক্ত মাধ্যম না থাকলে বিক্রয়া হবে না। আবার কলেজে পড়াকালীন ও বলতো, Love Marriage হল সর্বোত্তম বিবাহ। এখন ও School Teacher, সেদিন ফোনে কথা হল। বলল, জানিস তো তখন অপরিণত ছিলাম, ভুল ভাবতাম। Arrange Marriage -ই Best। এখানে বিক্রিয়ার মাধ্যম হল পরিবেশ। একটা ভাবাবেগের পরিবেশ, অন্যটা শিক্ষক শিক্ষক পরিবেশ। গোটা বিক্রিয়াটাই উল্টে গেল। অর্থাৎ কিনা বিক্রিয়ার মাধ্যমই বলে দেয় বিক্রিয়াটা কোন্ দিকে যাবে।

সুতরাং বিক্রিয়ার একদম সহজতত্ত্ব হল -- পরমাণু বা অণু যে অবস্থায় থাকে সেই অবস্থা থেকে আরও সুস্থিত অবস্থায় যাওয়ার জন্য নিজেদের মধ্যে পুনর্বিন্যাস ঘটায় সেই প্রক্রিয়ারই নাম বিক্রিয়া। বিক্রিয়াতে ভাঙা-গড় উভয় খেলাই চলে। প্রাথমিক অবস্থা ভেঙে আরও সুস্থিত নতুন অবস্থার পথে হাঁটা দেওয়ার নামই বিক্রিয়া।

আমাদের জীবনে প্রতি মূহুর্তেই বিক্রিয়া

চলছে। সেগুলো আমরা অনুভব করতে পারি, কারণ সেগুলো অনুভব না করলে জীবনের সঠিক দিশাটা খুঁজে পাই না। কিন্তু পরমাণুর বিক্রিয়াগুলোকে অনুভব করার জন্য যেহেতু বই পড়তে হয়, পরীক্ষা দিতে হয় তাই ওগুলোকে বুঝতে, জানতে ভয় পাই। একটা দিনের জন্য যদি বইটাকে বই না ভেবে এই সৌরজগৎটাকে বই ভাবতে পারি, তাহলেই দেখতে পাব আমরা প্রত্যেকটা পরমাণু হাজার হাজার বিক্রিয়া, ভাঙা-গড়ার খেলা প্রত্যেকটা মুহূর্তে ঘটিয়ে চলেছি।

সোনার বাংলা

—অনিমেষ ঘোলে

আমাদের সমগ্র বঙ্গবাসীর গর্বের বাংলা সোনার বাংলা পশ্চিমবাংলা। এই বাংলার উত্তরে রয়েছে সুন্দর সুন্দর পাহাড় ছোট বড় নদী, দক্ষিণে রয়েছে সমুদ্র উপকূল, সুন্দরবন, অসংখ্য নদী, দ্বীপ। এছাড়াও কোথাও কোথাও রয়েছে শাল, পিয়ালী ঘেরা জঙ্গল, কোথাওবা পাহাড়ী ঝর্ণা কোথাও বা রুক্ষ শুষ্ক অঞ্চল, কোথাও বা বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। এই বাংলা আমাদের কাছে মায়ের সমান। এই সুন্দর বাংলাতেই জন্ম নিয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র। জন্ম নিয়েছেন নজরুল ইসলাম, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্মেছেন শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, জগৎমাতা সারদা দেবী, বিদ্যাসাগর, উত্তমকুমার, যামীনি রায়, গিরীশ ঘোষ,সুপ্রিয়া দেবী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অসংখ্য অভিনেতা, লেখক-লেখিকা, গায়ক-গায়িকা, মুণি-ঋষি। আমার এই বাংলাকে নিয়ে বিশ্বের কাছে গর্ব করে বলতাম এই হল আমার বাংলা আমাদের বাংলা পশ্চিমবাংলা। এমন একটা সময় গেছে যে সময় বাংলা নিয়ে গর্ব করতে সাহস হয় না বা বলতে গেলে গলায় বাধে। কারণ একশ্রেণীর কিছু মুষ্টিমেয় মানুষ প্রায় তিন দশক ধরে বাংলাকে রক্তে লাল করে দিয়েছে, তারা দিনের পর দিন রক্ত গঙ্গা বইয়ে দিয়েছে। এক সময় বাংলায় পল্লী মাটির গন্ধের বদলে গন্ধ পাওয়া যেত বারুদের। পাখীর কলতানের বদলে শুনতে পাওয়া যেত গুলি বোমা বন্দুকের আওয়াজ। তারা সমগ্র পশ্চিম বাংলা জুড়ে তৈরী করেছে সন্ত্রাস। শাসনকে তারা শোষণে পরিণত করেছে। নন্দীগ্রামে নীরিহ মানুষের ওপর তারা চালিয়েছে গুলি। তারপর সিঙ্গুরে যারা নরকীয়ভাবে পুড়িয়ে মেরেছে এক ছোট্ট মেয়ে তাপসী মালিকে। তা ছাড়াও চালিয়েছে সন্ত্রাস, তারপর নানুর, দিনহাটা, ক্যানিং,কাকদ্বীপ, শবর, গড়বেতা, কেশপুর, দাসপুর, ছোট আঙ্গাড়ীয়া, তমলুক, লালগড়, নেতাই, কাঁথি, গাজল, মঙ্গলকোট, জামুড়িয়া, আসালসোল, পুরুলিয়া, পিরাকাটা, বলরামপুর, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর এমনকি সমগ্র পশ্চিমবাংলাকে এরা রক্তে লালকরে দিয়েছে। এদের এই নরকীয় অত্যাচারে মা হারিয়েছে তার সন্তানকে, ছেলে হারিয়েছে তার বাবাকে, বোন হারিয়েছে তার ভাই বা দাদাকে, স্ত্রী হারিয়েছে তার স্বামীকে। তারা অত্যাচারের পর অত্যাচার চালিয়ে গেছে।

প্রশাসনকে ভয় দেখিয়ে করে দিয়েছে দর্শক। নিজেদের অর্থ ভাগ-বাটোয়ারায় অসুবিধা হওয়ায় তারা খুন করেছে নিজেদের সহযোগীকে আর দোষ চাপিয়েছে অন্য নিরপরাধ মানুষগুলির ওপর। শুধু কি খুন, এরা কত নারীর নারীত্বকে হরণ করেছে, মেয়েদের উপর চালিয়েছে পাশবিক অত্যাচার, লুঠ করেছে সর্বস্ব। তারপর লাগিয়ে দিয়েছে আগুন। জোর করে খারাপ কাজ করতে বাধ্য করেছে। জোর করে কেড়ে নিয়েছে মায়ের সমতুল্য কৃষকের শেষ সম্বল জমি। কিন্তু আর নয়, এর পর তারা প্রতিবাদ করেছে। তাই সমগ্র বঙ্গবাসী বুঝে গেছে যে মারতে মারতে এদের অস্ত্র ফুরিয়ে গেছে। তাই এরা গর্জে উঠেছে। এই অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করে সূচনা করেছে শুভ শক্তি। ঐ মানুষগুলি ছিল এত নোংরা যে স্কুল কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে চালিয়েছে সন্ত্রাস, স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছিল স্বাস্থ্যব্যবস্থা। শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিকল করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু এক শুভ শক্তি এদের কালো হাত ভেঙ্গে দিয়েছে, উঠেছে নতুন সূর্য, জেগেছে বাংলা। হয়েছে উন্নয়ন, হয়েছে রাস্তা, ঘাট, বিদ্যুৎ, পানীয় জল, বদলে গিয়েছে পর্যটন মানচিত্র, তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন কলেজ, স্কুল, হাসপাতাল, শিল্প, সেজে উঠেছে সমগ্র বাংলা। হচ্ছে বিনিয়োগ, মুছে যাচ্ছে বেকারত্ব। হাসছে পাহাড়, হাসছে সমতল, হাসছে জঙ্গলমহল, তৈরী হচ্ছে নতুন দিগন্ত। মুছে যাচ্ছে সমস্ত দুঃখ, দুর্দশা, গ্লানি, ভরে উঠে খুশিতে তাইতো আমরা আবার জোর গলায় চিৎখার করে আনন্দের সাথে বলতে পারছি - এ বাংলা আমার বাংলা, তোমার বাংলা, বীরপুরুষের স্মৃতি দিয়ে ঘেরা চারিদিক সবুজে সবুজে ভরা আমাদের সোনার বাংলা পশ্চিমবাংলা।

বিষবৃক্ষ

– সৌমি সিংহ হাজরা
(খড়গপুর)

বিষাক্ত ঝোপ-নাম পার্থেনিয়াম। বাঁকুড়া পাতাভরা গাছে ছোট ছোট তারার মতো সাদা রঙের ফুল। বর্ষার জল পেয়ে রেল শহরের সমস্ত ফাঁকা জায়গা ও কোয়ার্টার্সের আশে পাশে গজিয়ে উঠেছে পার্থেনিয়ামের এই ঝোপ। শুনেছি, এই গাছের পাতা ও ফুল আমাদের দেহ-ত্বকের সংস্পর্শে এলে 'কন্ট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস' নামে একটি চর্মরোগ হয় যার চিকিৎসা করা কঠিন। অথচ যাতায়াতের পথে সর্বদাই লক্ষ্য করছি, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পার্থেনিয়ামের ফুল তুলে এখানে ওখানে ছড়িয়ে খেলা করছে। নিজেদের অজ্ঞাতেই এরা ওই চর্মরোগের শিকার হতে চলেছে। হয়তো তাদের বাবা-মা-অভিভাবকরাও এই বিপদ সম্পর্কে অবহত নন। তাই জনচেতনা জাগাবার জন্য রেল ও পুরসভার এ বিষয়ে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিৎ। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরাও তাঁদের কাছে আসা রোগীদের এ বিষয়ে সাবধান করে দেওয়ার কাজটা করতে পারেন। এটা যদি সম্ভব না হয় তাহলে গজিয়ে ওঠা বিষাক্ত উদ্ভিদ সমূলে উৎপাটিত করার ব্যবস্থা করতে পারেন রেল ও পুর-কর্তৃপক্ষে জনস্বাস্থ্যের খাতিরে। পরিবেশ দফতর এগিয়ে কিছু করতে পারেন। শুধু যে রেলশহরেই পার্থেনিয়ামের এই বাড়বাড়ন্ত তা নয়, রাজ্যের অন্য শহর ও গ্রামগঞ্জেও এই পার্থেনিয়ামের জন্ম উপস্থিতি চোখে পড়বে নিশ্চয়। তাই, সার্বিকভাবেই পার্থেনিয়ামের জন্ম ও বৃদ্ধিরোধ করার প্রয়োজন।

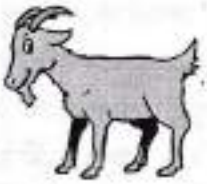

JOKES

—আসমাউল মিদ্যা
(বি.এ. সাম্মানিক, তৃতীয় বর্ষ)

।১।

কসাই-এর দোকানে সব ছাগলেরা একটিই গান করে। তাহল-"কর চলে হামফিদা জানো তন সাথীয়ো, অব তুমহারে হওয়ালে মটন সাথিয়ো।"

।২।

Wikipedia : I know everything.
Google : I have everything.
Facebook : I know everybody.
Internet : Without me you are nothing.
Electricity : Don't Angry me.

।৩।

একটি ছেলের একটি হাতে ছয়টি আঙুল ছিল। সবাই ওকে রাধেশ্যাম বলতো। কেন বলতো? আরে বলো-না কেন? কেন? কেন বলো না? কারণ ওর নামটাই ছিল রাধেশ্যাম। ফালতু এত ভাবার কি দরকার?

।৪।

মৌসম-এই মিলন! দ্যাখ ইনি হলেন আরিফ, ইনি একজন খুব ভাল হাতুড়ে ডাক্তার।
মিলন-ওহ! তা উনি তোর কে হন্?
মৌসম - আমার বাবা!

।৫।

মহাদেব শিব স্বর্গ থেকে মর্ত্যে মদ্যপান করতে এলেন। ১৮ বোতল বিয়ার খাবার পর Waiter বলল-আপনার নেশা হচ্ছে না কেন?
মহাদেব ঃ কারণ আমি ভগবান!!
Waiter - এতক্ষণে শালার নেশা হয়েছে।

।৬।

পেট্রোলের দাম বাড়ায় চারিদিকের জনজীবন যখন বিপর্যস্ত, তখন আমার এক বন্ধু আমাকে বলল-"আমার কিছু আসে যায় না, আমি আগেও ১০০ টাকার পেট্রোল নিতাম, আর এখনও ১০০ টাকারই পেট্রোল নেব।

।৭।

একটি শান্ত ছেলে আর ডাইনোসর-এর মধ্যে মিল কোথায়?
উঃ- দুটোই এখন পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত।

।৮।

সাফি ঃ শিবু দা! কালকের চপগুলো খেতে ভালোই লাগছিল। আজকেরটা এত খারাপ লাগছে কেন?
শিবুদা ঃ এ কী বলছো? এটা তো কালকেরই চপ।

এন.সি.সি. ও চাকরীতে অগ্রাধিকার

1942 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা 'ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং ক্যর' বলে যে বাহিনী তৈরী করেছিল, স্বাধীনতা লাভের পর সেই বাহিনীকেই দেশের উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের কাজে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। 1948 সালের 16ই জুলাই ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল National Cradet Corps আইন পাশ করেন।

স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে N.C.C. প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়। স্কুল থেকেই প্রশিক্ষণ শুরু হতে পারে। কলেজ স্তরেও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। মেয়েরাও প্রশিক্ষণ নিতে পারে। এই প্রশিক্ষণ নেওয়া থাকলে চাকরীর ক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়া যায়। আমাদের কলেজে প্রত্যেক বছর ৪০ জন ছাত্রছাত্রীকে NCC তে প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি নেওয়া হয়। June/July মাসে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

এন.সি.সি. সার্টিফিকেট :

মোট তিন ধরণের সার্টিফিকেট NCC তে দেওয়া হয়। স্কুল স্তরে 'A' সার্টিফিকেট এবং কলেজ স্তরে ছাত্রছাত্রীদের জন্য 'B' ও 'C' সার্টিফিকেট পরীক্ষার মাধ্যমে প্রতিরক্ষামন্ত্রক দিয়ে থাকে। প্রত্যেকটি সার্টিফিকেটের জন্য একসঙ্গে থিওরি ও প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষা পাশ করতে হয়। 'B' সার্টিফিকেট কোর্স পাশ করলে তবেই 'C' সার্টিফিকেট কোর্সে ভর্তি হওয়া যায়। তবে 'A' সার্টিফিকেট পাশ না করেও কলেজস্তরে 'B' সার্টিফিকেটের প্রশিক্ষণ নেওয়া যায়।

এন.সি.সি. -র সুযোগ সুবিধা :

'B' এবং 'C' সার্টিফিকেটধারীদের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় পুলিশবাহিনী, BSF, টেরিটোরিয়াল আর্মি, ইন্দো-টিবেটান বর্ডার পুলিশ ফোর্স, CISF, SSB এর মতো বিভিন্ন আধা সামরিক বাহিনীর চাকরীতে সংরক্ষণ আছে। সেনাবাহিনীতে কমিশণ্ড অফিসারের নিয়াগের পরীক্ষাতেও এন.সি.সি. ক্যাডেটরা অগ্রাধিকার পান। এমনকি পুলিশবাহিনীর সাব-ইন্সপেক্টর, ইনচার্জের এবং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেটের মতো পদে এন.সি.সি. ক্যাডেটদের অগ্রাধিকার আছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও NCC এর A, B, C সার্টিফিকেট হোল্ডারদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন। এমনকি দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার ক্ষেত্রে NCC ক্যাডেটদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে সেখানকার রাজ্য সরকারগুলি।

সোনামুখী কলেজ ছাত্রে সংসদ (২০১১-১২)

সভাপতি -- ডঃ বিজয়কৃষ্ণ ভাণ্ডারী

সহ-সভাপতি -- কুণাল মুখার্জ্জী

সাধারণ সম্পাদক -- বলরাম লাহা

সহ সাধারণ সম্পাদক -- গিয়াসউদ্দিন সেখ

ছাত্রে কমনরুম উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ -বিপুল দে

যুগ্ম সম্পাদক - পার্থ দাস ও সব্যসাচী ভট্টাচার্য

যুগ্ম সহ-সম্পাদক - সঞ্জীব গাঙ্গুলী ও স্বরূপ ঘোষ

ছাত্রী কমনরুম উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ -ডঃ সুনীতা মুখার্জ্জী

যুগ্ম সম্পাদিকা - প্রিয়াঙ্কা গোস্বামী, অনন্যা ঘোষ

যুগ্ম সহ সম্পাদিকা - প্রিয়াঙ্কা পাঁজা, রিয়া কুণ্ডু

সদস্যা - রুমা বিশ্বাস, তানিয়া ঘোষ, সঞ্চিতা সেন

সাংস্কৃতিক উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ - মইনুল হক, সুমনা সান্যাল

যুগ্ম সম্পাদক - দেবনাথ রক্ষিত ও প্রশান্ত নন্দী

যুগ্ম সহ সম্পাদক - বিশ্বজিৎ বিশ্বাস ও প্রদ্যুৎ ডাঙর

সদস্য/সদস্যা - তাপস রজক, রাহুল আদক, অনিমেষ কোলে

ক্রীড়া উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ - দীপক হেঁস, রাতুল সাহা

উপদেষ্টা - প্রসেনজিৎ ব্যানার্জী

যুগ্ম সম্পাদক - প্রদীপ কুমার মান ও চন্দন মিশ্র

যুগ্ম সহ সম্পাদক - বীজয় বীট ও প্রদীপ কুমার বারুই

সদস্য/সদস্যা - সাফিউল্লা মাল্লিক, কাঞ্চন কুমার দাস, চন্দন দাস, আকাশ সাহা

ছাত্রেছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি : (দিবাবিভাগ)

টিচার-ইন-চার্জ - ডঃ ধর্মদাস ব্যানার্জী

যুগ্ম সম্পাদক - অতনু গরাই ও সেখ সাদ্দাম

যুগ্ম সহ সম্পাদক - বিশ্বজিৎ মাজি ও অভিষেক ঘোষ

সদস্য/সদস্যা - চন্দন সূত্রধর, অরূপ বৈদ্য, অভিষেক সাহা, বুদ্ধদেব লাই

ছাত্রেছাত্রী কল্যাণ উপসমিতি : (প্রাতঃ বিভাগ)

টিচার-ইন-চার্জ - ডঃ ধর্মধাস ব্যানার্জী

যুগ্ম সম্পাদক- সুদন রজক ও বুদ্ধদেব লাই

সহ সম্পাদক - কাশীনাথ পাঁজা ও সঞ্জয় পাল

সদস্য/সদস্যা - সিদ্ধেশ্বর চেল, পার্থ নায়ক মিলকা ঘোষ

পত্রিকা উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ -ইন্দ্রজিৎ দাশ

যুগ্ম সম্পাদক - মঃ সেখ মইনুদ্দিন ও অনিরুদ্ধ নায়েক

যুগ্ম সহ সম্পাদক- বিল্টু ঘোষ ও পবিত্র নন্দী

সদস্য/সদস্যা - বুদ্ধদেব গোল্দার, পিন্টু হালদার দেবাশীষ চক্রবর্তী

বিজ্ঞান পরিষদ উপসমিতি :

টিচার-ইন-চার্জ - বাল্মাদিত্য মণ্ডল

উপদেষ্টা - তন্ময় পালিত , সেখ জাহিরুদ্দিন, দিব্যেন্দু বাউরী, সেখ সাজিবুল

যুগ্ম সম্পাদক - সন্দীপ গোস্বামী, আকাশ ধীবর

যুগ্ম সহ সম্পাদক - রাকেশ চ্যাটার্জী, শুভময় ঘোষ

সদস্য/সদস্যা - স্বরূপ ঘোষ, মৃত্যুঞ্জয় চৌধুরী, সুদর্শন, বলরাম ভট্টাচার্য, মিলন মণ্ডল, শুভরাজ্য ব্যানার্জী

আমাদের দাবী

কলেজগত :

১। সোনামুখী কলেজে NACC আনতে হবে।

২। অবিলম্বে কলেজের সামনের দিকে একটি Cycle Stand করতে হবে।

৩। ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার্থে নতুন Library টি দ্রুত চালু করার ব্যবস্থা করতে হবে এবং একটি সুন্দর Study Room চালু করতে হবে।

৪। কলেজে Class Room সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে।

৫। শিক্ষাদীক্ষার মানকে উন্নয়ন করতে সকলকে যথেষ্ট যত্নবান হতে হবে।

৬। কলেজের জন্য একটি Boys' এবং Ladies Hostel চালু করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৭। একটি Canteen নতুনভাবে করতেই হবে।

৮। ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিত Class করানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। Chemistry Honours এর জন্য একটি Laboratory-এর খুবই প্রয়োজন।

জেলাগত :

১। শিক্ষার উন্নয়ন ও গুনগত মান বজায় রাখা।

২। শালীনদীর ব্রিজ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত নেওয়া।

৩। সোনামুখী শহরে একটি বাসষ্ট্যাণ্ডের প্রয়োজন।

৪। সোনামুখী শহরে বাইপাস রাস্তার খুবই প্রয়োজন।

৫। Sonamukhi Hospital কে উন্নতমানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬। কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা।

৭। সোনামুখীতে পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন।

ছাত্র সংসদের সাফল্য

১। College এ ২০১২-র শিক্ষাবর্ষে সমস্ত ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার উন্নতি ও সুবিধার জন্য নতুন বই হয়েছে ৩০০০০০ টাকা।

২। ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে Chemistry Honours. চালু করা হয়েছে।

৩। নূতন Library তৈরীর কাজ চলছে যা দ্রুত চালু হতে চলেছে।

৪। নতুন Boys' Toilet তৈরী হয়েছে।

৫। College এর সামনে দুটি সুন্দর বাগান যা সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে।

৬। সমস্ত সাম্মানিক বিভাগে সিট সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

৭। Physical Education Subject টি চালু হয়েছে।

৮। কলেজের পঠন-পাঠন এবং ছাত্রছাত্রীর পরিষেবা উন্নত হচ্ছে।

নতুন ভারত যারা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের কেবল দিয়ে যেতে হবে, -- নিজেকে বিলিয়ে কাঙাল হয়ে যেতে হবে - প্রতিদানে কিছু না চেয়ে।

-- সুভাষচন্দ্র বোস

Prize Distribution

N.S.S. Camp 2011-12

Cleanliness is Nest to Godlines

N.S.S. Volunteers

Survey by N.S.S. Cadets.

Inauguration Ceremony of N.S.S. Camp.

Printed At : Sreema Printers'
Sonamukhi, College Road, Bankura, Mob.- 9851440125